বনস্পতি

(ছোট গল্প)

কলিকাতা
মডার্ণ পাবলিশার্স
৩১, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড

প্রকাশক—
শ্রীশরৎ চন্দ্র দাস
মডার্ণ পাবলিশার্স
৩১নং, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড,
কলিকাতা।

পৌষ—১৩৫১
দেড় টাকা

ইন্দু প্রেস, ৩১নং, আশুতোষ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা হইতে
শ্রীমনীন্দ্র নাথ দত্ত কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

নিয়ন্ত্রিত মূল্যে কাগজ পেয়েছি মেসার্স বেঙ্গল পেপার মিল কোং লিমিটেডের শ্রীপ্রতাপ কুমার সিংহ মহাশয়ের নিকট হইতে। আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি তাঁহাকে।

মঃ পাঃ

ভূমিকা

সোমেন চন্দের গল্প-সংগ্রহ হাতে লইলে এই কথাই মনে জাগে প্রথম সোমেন ছিল এক সম্ভাবনা। কিন্তু সে যে কত বড় বেদনার কারণ—সোমেন চন্দের গল্পগুলি শেষ করিয়া ভাবিতে হয় তাহাই।

আমাদের মতো অনেকের কাছে সোমেন চন্দ তাহার পরিচয় লিখিয়া গিয়াছে অন্য ভাষায়। সেই লিপি রক্ত দিয়া লেখা। পৃথিবীর দাবীকে সে বুক দিয়া স্বীকার করিয়াছে, আমরা জানি উহাই তাহার লেখা, আর উহাই তাহার সত্তার সংকেত। কিন্তু প্রথম যে দিন সোমেন চন্দের "ইঁদুর" গল্পটি পড়িয়াছিলাম সেদিন আমাদের বিস্ময়ের সীমা ছিল না। তার পরে সোমেন চন্দের প্রথম গল্প সংগ্রহ 'সংকেত' আমাদের হাতে আসিয়া পড়িল। সে দিন সর্বাপেক্ষা বড় হইয়া উঠিয়াছিল আমাদের সেই বিস্ময়—বাইশ বছরের যুবক কি করিয়া জানিল এই জীবনের সংকেত? ইহা তো শুধু মাত্র তাহার সত্তার সংকেত নয়, ইহা যে তাহার অচেতন সহযাত্রীদেরও জীবন-গাথা, তাহাদেরও জীবনের সংকেত—সংকেত তাহাদের জীবনের, আর তাহাদেরই সতীর্থ সোমেনের জীবন-বোধের। এমন একটা বিস্ময়ের জন্য সচরাচর আমরা প্রস্তুত থাকি না।

'বনস্পতির' এই গল্পগুলিতেও সেইরূপ প্রতিভারই স্বাক্ষর রহিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য যাহা তাহা এই যে, ইহাতেও বাহুল্য নাই। সোমেন বোধ হয় তখন আরও অল্প বয়স্ক ছিলেন, কিন্তু তখনি তাহার দৃষ্টি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে—

"বনস্পতিতেই" তাহাও দেখিতে পাই। কিন্তু ইহারও অপেক্ষা সহজ দেখি তাহার জীবন-রসের অনুভূতি শক্তি—"মরূদ্যানে" তাহাই স্পষ্ট। স্বচ্ছন্দ এই বোধ, উচ্ছাস নাই, কিন্তু আনন্দে টলমল। স্বচ্ছ, উজ্জল,, প্রাণ-যাত্রায় এমন আকুলিত না হইলে সোমেন রূপমুগ্ধই থাকিয়া যাইত, জীবনের প্রেমরসের সন্ধান এই বয়সে পাইত না। কারণ, সোমেন শুধু 'fine writing' এর নেশায় মাতাল হইয়া যায় নাই, 'fine doing' এর প্রেরণায়ও সে বাড়িয়া উঠিবার সুযোগ পাইয়াছিল।

কিন্তু কথাটা পরিষ্কার করিয়া বুঝা দরকার। এই গল্পগুলিতে দেখি সোমেনের কল্পনায় পরিণতি আসিতেছে, তাহা আসিবে; কিন্তু তাহা আসিয়া যায় নাই, এই কথাও বারে বারে মনে হইবে। তাহার প্রতিভা ফুটিতেছে। যাহা সম্ভাব্য ছিল তাহা সম্পূর্ণ হয় নাই। তাহা বুঝিতে পারি কোথাও একটু সামান্য লেখার ভঙ্গিতে, সামান্য দুই একটি ভাষার ত্রুটীতে। কোথাও বা গল্পের সামান্য একটু ঢিলে-ঢালা গড়নে; কোথাও বা লেখকের বয়ঃসন্ধি-সুলভ প্রেমপ্রণয়ের কথা বলিবার লোভে। হয়ত তাহা রহিয়াছে সোমেনের সময়াভাবের জন্য, হয়ত বা রহিয়াছে সোমেনের বয়সের জন্য। কিন্তু সোমেন সম্পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই বিদায় লইয়াছে, তবু ইহা না ভাবিয়া পারা যায় না; না ভাবিয়া পারা যায় না—তাহারও রহিল "an inheritance of unfulfilled renown".

এই গল্প-সংগ্রহে আমরা যে সোমেনকে দেখিলাম, বনস্পতির সম্ভাবনা তাহারও মধ্যে ছিল;—এই কথা এই সংগ্রহ মনে করাইয়া দেয়। কিন্তু 'সম্ভাবনা' আর বাস্তবে 'রূপলাভ' এক কথা নয়। 'হইতে পারে' আর 'হইয়া উঠার' মধ্যে একটা প্রকাণ্ড অজানা ব্যবধান থাকে; কোনো এক

উৎক্রান্তিতে তাহা উত্তীর্ণ হইতে হয়। সেই উৎক্রান্তিই বয়সের ও অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়া সোমেন চন্দ সবে আয়ত্ত করিতেছিল, এমন সময় গুপ্তাঘাতে তাহার জীবন শেষ হয়—বাঙালা দেশ ও বাঙালা সাহিত্য এক সমাগত প্রতিভাকে হারাইল। এই গল্পগুলিতে আমরা দেখি সেই বিকাশোন্মুখ প্রতিভা প্রথম বসন্তের বার্তা লাভ করিয়া তাহার নূতন কিশলয়-দল খুলিয়া দিতেছে, জানি ফুল ফুটিবে—আর ভাবি কোথায় সেই ফুল?

শ্রীগোপাল হালদার

মরুদ্যান

হাজরাদের বাড়ী বীণা বেড়াইতে গিয়াছে। পাড়ার অন্য দুই একটা বাসা খুঁজিয়া সেখানে রণু গিয়া তাহাকে পাইল। বীণা আরও কয়েকজন মেয়ে ও বধুর সাথে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

রণু ঘরের বাহিরে দাঁড়াইয়াই ডাক দিল, বীণাদি, শুনে যান তো।

বীণা বলিল, ওখান থেকেই বলো।

হাজরাদের বধু কনক হাসিয়া বলিল, ও রণজিতের বীণাদি বুঝি এসেছে এখানে? নইলে কোন দিন যে ভুলেও এ বাড়ীতে পা দেয় না, সে আজ এলো! বীণাদির সাথে কি কথা আছে আমরা শুনতে পারবো রণু?

একটা মৃদু-হাস্য-তরঙ্গ খেলিয়া গেল।

রণু লজ্জায় মাথাটা ঈষৎ কাৎ করিয়া বলিল, আপনি কি যে বলেন বৌদি। হ্যাঁ, বীণাদি, শিগগির—

গোটাকতক কথা রণুর সকলের সঙ্গেই থাকে।

কনক বলিল, তুমি তো এবার আই-এ দিচ্ছ, টেষ্ট কবে? এসে পরেছে নিশ্চয়ই—

রণু মাথা নাড়িল।

—তাইতো শেষ রাতে অত পড়ার শব্দ শুনতে পাই। আহা, অত পড়লে শরীর যে খারাপ হয়ে যাবে ভাই! তোমার বীণাদি তোমাকে মানা করে না এজন্যে?

বীণা আর রণুর দিকে সকলে চাহিয়া আবার হাসিল।

রণুর অবস্থা দেখিয়া বীণা তাড়াতাড়ি খাট হইতে নামিয়া আসিল। সিড়ি বাহিয়া নামিতে নামিতে সে জিজ্ঞাসা করিল, কি হয়েচে?

রণু বলিল, ওই যে কারা দেখতে আসবে বলেছিল ওরাই তো এসে বসে রয়েচে। বড়দা তো রাগে সারা বাড়ী মাথায় করে তুলেছেন। সে ভীতদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিল।

বীণা হঠাৎ একটু উষ্ণ হইয়া বলিল, রাগ করেছে, বড় বয়ে গেছে—আমার! বলতে পারো, রোজ রোজ আমাকে এরকম সং সাজাবার মানেটা কি? রণু যেন, নিজেকেই অপরাধী মনে করিল।

বাসায় আসিয়া বীণা সরাসরি তাহার মা কাদম্বিনীর ঘরে চলিয়া গেল। কাদম্বিনী বলিলেন, কোথায় গিয়েছিলি বলতো? তোকে তো আগে বলা-ই হয়েছিল, আজ ওরা দেখতে আসবে। নে,, আর দেরী নয়, কাপড় বদলিয়ে আয়, ওরা আবার বসে রয়েচে।

বীণা জানালার পাশে নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া বাহিরের দিকে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। কাদম্বিনী আবার কি বলিতে যাইবেন এমন সময় বড়দা আসিয়া ঘরে ঢুকিলেন, বীণাকে তেমন ভাবে দেখিয়া রাগিয়া বলিলেন, এই যে, কোত্থেকে বেড়িয়ে আসা হলো শুনি? গুণবতী বোন আমার, সারাদিন কেবল মানুষের বাসায় ঘুরে বেড়ানো। আমি ভাবি যাদের বাসায় ও যায়, তারা কি মনে করে।

বীণা তেমনি দাঁড়াইয়া রহিল।

বড়দা বলিলেন, যান এখন, রুজ পাউডার কতগুলো ধ্বংস করে আসুন গে, তাড়াতাড়ি যান। আর এই যে—তিনি রণুকে সুমুখে দেখিয়া আরও ক্ষেপিয়া গেলেন,—আর একজনকে পাঠিয়েছি ডেকে আনতে, তারও কোন খোজ খবর নেই। বুঝলে মা, এমন মেয়েঘেষা ছেলে আমি আর কখনও দেখিনি।

মাথা নত করিয়া রণু দাঁড়াইয়া রহিল। সে এ-বাড়ীর ছেলে নয়, জ্ঞাতি সম্বন্ধে একটু আত্মীয়তা আছে। খুব গরীব, এখানে থাকিয়া পড়ে।

এবাড়ীর সকলেই বড়দাকে বাঘের মত ভয় করে। তিনি যাহা একবার মুখ দিয়া বল্লেন, তাহা করিয়া তবে ছাড়েন, তাহাতে যদি সংসারে কোন ওলট পালট হইয়াও যায়, কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

বড়দা কাদম্বিনীকে বলিলেন, ছাখো মা, লেখা-পড়া জানলে অন্য সব গুণও আপনি হয়ে যায়, এ এমনই জিনিষ। ওই তো, সেবার শিলংএ গিয়ে ওঁরই সম্পর্কে এক মাসতুতো বোনকে দেখলাম, কি সুন্দর আর কত গুণ, নিজেদের কথা মনে হলে রীতিমত লজ্জা করে।

বীণা এবার রাগিয়া গেল, কোনদিন সে বড়দার মুখের উপর কথা বলে না, কিন্তু আজ বলিল, আচ্ছা, আমি কি নিজে থেকেই পড়লুম না, না তোমরাই আমাকে পড়ালে না, কোনটা সত্যি? আমি বলে রাখছি, আমাকে এ রকম করে জ্বালালে আমি কিছুতেই এবাড়ীতে থাকবো না। আজ বাবা থাকলে নিশ্চয়ই এ রকম কথা তোমরা আমায় বলতে পারতে না। রূপ কি সকলের থাকে? তাই বলে—বীণা আর বলিতে পারিল না, কান্না চাপিয়া পাশের ঘরে চলিয়া গেল।

ছেলের উপর কথা বলিবার শক্তি কাদম্বিনীর ছিল না, তিনি হতভম্বের মত বসিয়া রহিলেন। বড়দার সমস্ত রাগ গিয়া পড়িল রণুর উপরে, তিনি একরকম চেঁচাইয়া বলিলেন, এখানে হা করে কি দেখছো? যে ভদ্রলোকগুলি আমাদের মত বড়লোকের বাড়ীতে কৃতার্থ হতে এসেচেন তাদের বিদায় করগে, যাও। যত সব—আমার এখানে কারুর জায়গা হবে না বলে দিলাম। আরে বাপু, গরীবের ছেলে লেখাপড়া ছাড়া অন্যদিকে মন গেলে যে বাপের রক্ত জল করা পয়সার কোন মর্য্যাদা থাকবে না। সমস্ত বাড়ীর মধ্যে একটা বিপর্য্যয় ঘটিয়া গেল! এই রকম ঝড় ঝঞ্ঝা এ সংসারে প্রায়ই আসে নূতন কিছু নয়।

রাত্রে বড়দা ঘুমাইলে পর কিছুটা শান্ত হইল। মোটা, ঘুম কাতুরে মানুষ, অল্প রাত্রেই গভীরভাবে ঘুমাইয়া পড়েন।

সেদিনের জন্য পড়া রাখিয়া রণু উপরে বড়দার নাক ডাকার বিকট শব্দ শুনিয়া নির্ভয়ে বীণাকে খুঁজিতে গেল। তাহার শুইবার ঘরে তাহাকে পাওয়া গেল না। রণু কাদম্বিনীর কাছে গিয়া দেখিল, সেখানেও বীণাদি নাই। সে চুপি চুপি সিড়ি বাহিয়া ছাদের উপরে গেল।

চিলে কোঠার পূর্ব্ব দিকের আলিসায় ভর দিয়া বীণা দাঁড়াইয়াছিল। জ্যোৎস্নাময় রাত্রি, চাঁদের আলো তাহার কাপড়ে পড়িয়া ফুটফুট করিতেছিল। পাশেই ছাদ আর আলিসায় তাহারই ছায়া দীর্ঘতর হইয়া লাগালাগি দাড়াইয়া আছে।

রণু আস্তে ডাক দিল, বীণাদি।

বীণা প্রথমে চমকিয়া উঠিল, মুখ ফিরাইয়া তাহার দিকে চাহিয়া আবার আগের মত দাড়াইয়া বলিল, কেন ?

কাছে আসিয়া রণু কহিল, খেয়েচেন ?

বীণা চুপ করিয়া রহিল।

চলুন তাহলে, বড় দা ঘুমিয়েচে, আমিও খাইনি। জ্যাঠাইমা তো আপনাকে খুজছে। বীণা এবার একটু হাসিল, বলিল, তুমি যাও রণু। পড়া হয়েচে ? পরীক্ষা কবে না বলেছিলে ?

খুশী হইয়া রণু বলিল, এই কালকে এক সোমবার, তার পরের সোমবার আমাদের পরীক্ষা আরম্ভ হবে। আমার কিচ্ছু পড়া তৈরি হয়নি, কি যে করবো ভেবে পাইনে। তার ওপর প্রিন্সিপাল নাকি এবার বলেছেন, খুব কষে ছাত্র পাশ করাবেন। কারণ, গত বার অনেকে ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করেছিল। বড় ভয় করচে তাই—

রণু মুখের এমন ভঙ্গী করিল, যেন এখনই সে ফেল করিয়া ফেলিয়াছে।

করুণ চোখে রণু বলিল, কি হবে ? আর পড়া হবে না, বাবা কষ্ট পাবেন, আর বড়দার মনেও আঘাত লাগবে, তাঁর বাড়ীতে থেকে পড়লুম, পাশ করতে পারলুম না। তখন কি যে হবে আমার ভাবতে ভয় করে।

বীণা হাসিয়া বলিল, ওরে বাবা, এতেই ভয় পেয়ে গেলে? সত্যি কি তাই হয়ে গেল নাকি? তুমি কক্ষনো ফেল করবে না, আমি বলছি। তা যাক্। আচ্ছা রণু, তুমি পাশ করে তারপর কি করবে, চাকরি?

—তা জানি না। তবে, পাটনায় আমার এক কাকা থাকেন ভালো অবস্থা, তার ওখানে যাবো।

বীণা একটু অন্যমনস্কভাবে আকাশের জ্যোৎস্নাবর্ষী খণ্ড চাঁদের দিকে চাহিল, তারপর রণুর পানে স্থির ভাবে তাকাইয়া বলিল, আমার টাকা থাকলে তোমাকে আমি পড়াতাম।

রণু চুপ করিয়া রহিল, কিছুক্ষণ পরে কহিল, আমার ভাইবোন কেউ নেই বীণাদি কাজেই তাদের স্নেহ থেকে আমি বঞ্চিত কিন্তু আপনাকে আমার বড় মনে পরবে, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন—

হাসিয়া বীণা বলিল, কি বললে শুনি?

হঠাৎ ভয়ানক লজ্জা পাইয়া রণু, কি বলবো আবার, আমি কিছু বলিনি তো, বলিয়া তাড়াতাড়ি নীচে নামিয়া গেল।

রণুর পাশের ঘরেই বীণা তাহার ছোট বোন লীলা আর বড়দার ছোট মেয়ে গীতার সঙ্গে শোয়। খুব সকালে ওঠা তাহার চিরকালের অভ্যাস। তাছাড়া শীতকালের রাত্রি দীর্ঘ বলিয়া অনেক আগেই ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়। একবার ঘুম ভাঙ্গিয়া গেলে আর সহজে সে ঘুমাইতে পারে না। তাই কখনও লীলা বা গীতাকে জাগাইয়া গল্প করে, নয়তো পাশের ঘরে তাহার মামাকে ডাকিয়া পদ্মানদীর কাহিনী শোনে।

রণুর পরীক্ষার আগের দিন শেষ রাত্রেও বীণা জাগিয়া শুনিতে পাইল, দেয়ালের বড় ঘড়িতে চারটা বাজিয়াছে। অনেক রাত্র পর্য্যন্ত পড়িয়া রণু টেবিলের ছোট ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়া রাখিয়াছিল সাড়ে তিনটার কিন্তু এখনও সে ওঠে নাই, বোধ হয় গভীর ঘুমে অ্যালার্মের শব্দ শুনিতে পায় নাই।

বীণা আস্তে আস্তে তাহার ঘরে গেল, টেবিলের উপর বাতিটার আলো বাড়াইয়া দিয়া রণুর বিছানার কাছে গিয়া ডাক দিল, রণু, অ রণু—

কয়েক ডাকের পর সে চোখ বুজিয়াই সারা দিল, কেন?

—চারটে যে বেজে গেছে, পড়বে বলেছিলে না?

- হু। কিন্তু উঠিবার কোন লক্ষণই তাহার দেখা গেল না। বেশী রাত্রে ঘুমাইয়া চোখ হইতে ঘুম ছুটিতে চায় না সহজে।

—আমি তো ঘড়িতে অ্যালার্ম দিয়েই রেখেচি।

—হু, দেখবে চলো, গম্ভীর ভাবে বীণা রণুকে উঠাইয়া ঘড়ির সামনে আলো ধরিয়া দেখাইল। আশ্চর্য্য হইয়া রণু তাহার দিকে চাহিল।

বীণা বলিল, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই, ওটা কখন পড়ে গেছে কিন্তু আমাদের ঘুমকাতুরে রণুর কানে সেটা যায় নি। ভাগ্যিস আমি উঠে ডাক দিয়েছিলাম, নইলে যে কি হতো!

চেয়ারে বসিয়া রণু বলিল, খুব খারাপ হতো। জুলিয়াস সিজারের কতখানি এখনও না পড়া রয়ে গেছে, সেগুলি সারতে হবে, আবার সমস্ত পড়া রিভাইস্ করতে হবে, সময়ের দরকার অনেক। আমি কখন ঘুম থেকে উঠতাম কে জানে, শুতে যে রাত হয়ে গিয়েছিল।

—আমি যাই, তুমি পড়ো। বীণা চলিয়া গেল। পড়িতে পড়িতে রণুর ভোর হইল, তারপর বেলা আটটাও বাজিয়া গেল।

বড়দা ঘরে ঢুকিয়া বলিলেন, একটা কাজ করবে। এই যে চিঠিটা, নরেন মজুমদারের বাসা চেন তো, সেই যে ফর্সা লম্বা লোকটা, আমার এখানে প্রায়ই আসে, ওকে এই চিঠিটা দেবে। উনি তখনই এর উত্তর দিয়ে দেবেন, তুমি সঙ্গে করে তা নিয়ে আসবে, খুব জরুরি কিন্তু, বুঝলে। আর তাঁর বাসাটা কোথায়, দাঁড়াও, দাঁড়াও বলে দিই তোমাকে, ইয়ে—

রণু করুণ ভাবে বড়দার দিকে চাহিল, এখন সে যায় কেমন করিয়া।

সামনে দাড়াইয়া বীণা সব দেখিতেছিল, সে বলিল, ওর কি না গেলে চলে না বড়দা? পড়ার ক্ষতি হবে যে। কেন, ছোড়দা যাক্ না। ডেকে দেবো?

ছোড়দা কিছু করে না, বসিয়া থাকে। ভোরবেলা এককাপ চা খাইয়া সে কোথায় বাহির হইয়া গিয়াছে।

বড়দা বলিলেন, অজিত তো নেই বাসায়, কেন, ওই যাক না, এখন আর পরে কি হবে? বীণা বলিল, না, ওর যেয়ে কাজ নেই। অন্য কেউ যাক্।

বড়দা মনে মনে রাগিতেছিলেন। এই বোনটীকে তিনি আসলে কিছু ভয় করিতেন কিন্তু সেটা বাহিরে সহজে প্রকাশ করিতেন না, ইহা তাহার স্বভাব নয়। নিজের কর্ত্তৃত্বের অপমান তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

তবে এ ব্যাপারে এবার তিনি আর বেশী কিছু বলিলেন না, গম্ভীরভাবে বাড়ীর ভিতর চলিয়া গেলেন।

বীণা বলিল, তুমি কি রণু! মুখফুটে কিছু বলতে পারো না, পরের বাড়ীতে থাকো বলে কি সব কাজই করতে হবে নাকি? বড়দাকে দোষ দে'য়া যায় না, ওঁর ওটা স্বভাব কিন্তু তাই বলে তোমার নিজস্ব কিছু নেই নাকি? ঘড়ির দিকে চাহিয়া সে বলিল, এখন আটটা বেজে পনেরো মিনিট হয়েছে, ঠিক সাড়ে নয়টার সময় স্নান করতে যেয়ো, বুঝলে, আমি মাকে গিয়ে বলছি।

বীণা চলিয়া গেল।

রণুর টেষ্ট শেষ হইয়া গেল। নূতন উদ্যমে আবার সে ফাইন্যালের জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিল। পড়া আর পড়া—রণুর যেন ইহা ছাড়া আর কোন কিছুই করিবার নাই।

ঘরে ঢুকিয়া বীণা বলিল, মা, রণুর জ্বর হয়েছে।

আশ্চর্য্য হইয়া কাদম্বিনী কহিলেন, জ্বর হয়েচে? এই পরীক্ষার সময় আবার জ্বর হলো? ও কি করচে এখন?

দিলীপের সাথে ব্যাগাটেলী খেলছে।

ওকে শুয়ে থাকতে বলগে, আমি আসচি।

পরের দিন রণুর জ্বর কমিল না। না কমিলেও তত কাতর হইল না। ছোট ছোট ছেলে মেয়েদের সাথে গল্প করিয়া খেলিয়া সে দিন তাহার কাটিল।

কিন্তু তৃতীয় দিন বৈকালে জ্বর অত্যন্ত বাড়িয়া গেল। রণু মাথার বেদনায় কথা বলিতে না পারিয়া চুপ করিয়া পরিয়া রহিল।

বীণা আগে ইহা লক্ষ্য করে নাই, সন্ধ্যাবেলা তাহার কপালে হাত দিয়া দেখে যে, শরীরের উত্তাপ ভয়ানক বাড়িয়াছে। চোখ দুটী ঈষৎ লাল, আর ফুলিয়া গিয়াছে।

সে ভীতস্বরে ডাকিল, রণু

—কি ?

মাথাটা ধুইয়ে দিই, কেমন ?

রণু বীণার দিকে পাশ ফিরিয়া বলিল, বীণাদি, একটা কথা বলি। আমাকে হাসপাতালে যাবার ব্যবস্থা করে দিন। বাসায় এত লোকজন, একজনকে দেখতে হলে আর একজনের পানে তাকানো চলে না। কেন মিছিমিছি আপনারা কষ্ট করবেন ? এখনও আমি উঠে যেতে পারি, পরে হয়তো পারবো না। আপনি ব্যবস্থা করুন।

বীণা তাহার কপালে, চোখের পাতায়, মুখে হাত বুলাইয়া বলিল, কি বাজে বকছো রণু ! আমি জল নিয়ে আসি, দাঁড়াও।

ডাক্তার আনান হ'ল, তিনি ওষুধের ব্যবস্থা করিয়া গেলেন।

অনেক রাত্রি অবধি তাহাকে বাতাস করিয়া বীণা গিয়া শুইল।

পরের দিন এক রকমই রহিল। রণু ঠিকই বলিয়াছিল, এত লোক-জনের মধ্যে শুধু একটা অসুবিধার সৃষ্টি করা।

কাদম্বিনী বীণাকে একান্তে কহিলেন, ওর বাবাকে খবর দেব ? কি বলিস ?

বীণা বলিল, না মা, দরকার নেই। অসুখ এমন বেশী কি হয়েছে যে কাকাকে খবর না দিলে চলবে না? আজ যদি আমাদের কারুর এরকম হতো তবে কি করতে?

—না, তা বলছি না। এ পরীক্ষার সময়, যদি খারাপ কিছু হযে দাঁড়ায় তবে দোষের ভাগী হবো আমরা।

খারাপ কিছু হইল না। পরের দিনই জ্বর কমিয়া গেল।

রণু হাসিয়া কথা কহিল। কাদম্বিনী যেন হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

অসুখ সারিবার পরে একদিন রাত্রে বিছানায় শুইয়া হঠাৎ রণুর কি যেন মনে পড়িয়া গেল। সারা অসুখের সময় কাহার যেন স্নেহের পরশ, তাহার দুঃখ কষ্টের জন্য সচেতন অভিব্যক্তি, কোনদিন কবে অনুভব করিয়াছিল, দেখিয়াছিল, নদীর পাশে শুষ্ক বালুচরে সপ্তমীর চাঁদের অস্পষ্ট জ্যোৎস্নার মত কায়া লইয়া সে দাড়াইয়া। রণু হঠাৎ বসিয়া কি জানি কাহার উদ্দেশ্যে জোর হাত করিয়া নমস্কার করিল। সে লক্ষ্য করে নাই, ঘরে আছেন সেই মামা, দেখিয়া ফেলিলেন সব। রণু লজ্জা পাইল। মামা হাসিয়া বলিলেন পরীক্ষা কাছে এলেই বুঝি অদৃশ্য দেবতার উপর দৃষ্টি পড়ে? কি বল রণু?

এ প্রসঙ্গ চাপা দিবার জন্য রণু বলিল, আপনাদের কয়টা বাড়ী পদ্মা নিয়েচে মামা? কেউ মরেনি তাতে?

মুচকি হাসিয়া তিনি বলিলেন, কেঁউ মরে নি।

এক একটা কাজ রণু করিয়া বসে, পরে ভাবিলে হাসি পায়।

একবার তাহার দুঃখ আর দারিদ্র্যের কথা বীণাদিকে বলিতে যাইয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া কান্না আসে আর কি!

তবে সে দিনের কথা সত্যিই বড় মনে পড়ে। রাত্রির পৃথিবীতে সকলের অলক্ষ্যে এক অবহেলিত আত্মার কাছে দু হাত পাতিয়া সে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, সেদিন চারিদিকের নিস্তব্ধতায় আর দুঃখের কথায় চোখের জল আসিয়া পড়িয়াছিল, তাহা সত্যি।

রণুর পরীক্ষা হইয়া গেল অর্থাৎ এদিকের সব মিটিয়া গেল।

ফল বাহির হইতে তখনও অনেক বাকী। রণু বাড়ী যাওয়া ঠিক করিয়া ফেলিল। ফেলই হউক আর পাশই হউক, এর পরে আর পড়া তাহার কোন রকমেই হইতে পারে না। তাছাড়া, বড়দাও তাহার খরচ বাড়তির জন্য তাহাকে এখানে রাখিতে চাহিবেন না।

কাদম্বিনী সৌজন্যের খাতিরে বলিলেন, ফলটা বেরুলে পর গেলে হতো না?

দরকার নেই জ্যাঠাইমা, রণু হাসিয়া বলিল, আমি পাশ করবো।

কাদম্বিনী খুশী হইয়া বলিলেন, নিশ্চয়ই করবি। তুই কি আমাদের অজিত, বাবা, যে বছর বছর শুধু টাকা খরচ করতে হবে?

রণু বলিল, আচ্ছা জ্যাঠাইমা জিতু বলে একটী ছেলে যে এসেছিল এখানে ও-ই যে আপনার মাসতুতো না পিসতুতো ভাইএর ছেলে, ও বুঝি বিলেত যাবে?

—যাবে না তো কি? মস্ত বড় লোক ওরা, তার ওপর ছেলেটাকে দেখেচিস তো, কেমন, মুখের ওপর একটা বুদ্ধির দীপ্তি। অনেকটা তোর মত···তোরও ওরকম হতো, কেবল পেছনে পয়সার জোর নেই বলে।

আশ্চর্য্য হইয়া রণু বলিল, কি বলেন আপনি, জ্যাঠাইমা? আমার হতো না, কক্ষণো হতো না, বড়দাই তো বলছে যে············

হাসিয়া কাদম্বিনী বলিলেন, কি বলেছে?

—নিজেকে নিজে বকবো? রণু হাসিয়া ফেলিল। কাদম্বিনীও হাসিলেন।

আশ্চর্য্য বটে! যাইবার সময় বীণাকে বাড়ীশুদ্ধ খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। বেলা তিনটায় ট্রেন।

একবার দেখা হইয়াছিল কিন্তু অতি অল্প ক্ষণের জন্য।

রণু কাদম্বিনীর কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বীণাদিকে খুঁজে পাচ্ছিনা জ্যাঠাইমা, গাড়ীর সময় হয়ে এসেচে যে !

—দ্যাখ পাড়া বেড়াতে বেড়িয়েছেন বুঝি ?

সেই হাজরাদের বাসায় বীণাকে পাওয়া গেল। সে কনকের সাথে বসিয়া গল্প করিতেছিল।

আগেই কনক হাসিয়া বলিলেন, রণু কেন আমাদের বাসায় এসেচে আমি তা জানি।

—আপনার সব সময়ই ঠাট্টা বৌদি, রণু বলিল।

—আমার কি দোষ ভাই, বীণা তো এতক্ষণ তোমার কথাই বলছিল, তোমার পরীক্ষা হয়ে গেছে, ফল বেরয়নি কিন্তু তার আগেই তুমি চলে যাবে, তোমার নাকি পড়বার ইচ্ছা ভয়ানক, তা হলে কি হবে, বীণা বলে, যে চায় সে পায় না। তাছাড়া আরও কতো কি ?·········তোমার মতো ছেলে খুব কম দেখা যায়।—কনক হাসিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িলেন।

আর চোঁখে জল ভরিয়া আসিল রণুর। কোন দিন তাহার এ দুর্ব্বলতা দেখা দেয় নাই, আজ কি জানি কেন দিল। সে তাড়াতাড়ি অন্যদিকে চাহিয়া বলিল, বীণাদি চলুন শিগগির।

বাসায় আসিয়া রণু কি যে বলিবে খুঁজিয়া পাইল না।

বীণা প্রথমে কহিল, যেখানেই থাকিনা কেন, তোমাকে আমি মনে করবো ভাই।

—তা জানি বীণাদি। আমিও আপনাকে কোনদিন ভুলবো না। রণু আর বলিতে পারিল না।

তারপর গলি শেষ হইবার আগে রণু একবার পিছন পানে তাকাইয়া দেখিল, সকলেই তাহার দিকে চাহিয়া আছে, নাই কেবল বীণা।

ভালো-না-লাগার শেষ

রমলা বিরক্ত হ'য়ে উঠলো। যেন এত বিরক্তি তার কোনদিন আসেনি। নইলে ইক্‌নমিক্সের পপুলেশান চ্যাপ্টারটা তো জমে' ওঠবার কথা কিন্তু আজকার ক্লাশে কিছুতেই যেন তার লেকচার গভীর হ'য়ে উঠলো না।

এমন এক-একটা দিন আসে সত্যি যখন কিছুই ভালো লাগে না। আজ যেন তাই।

সে যেন আজ প্রথম টের পেলে, ইস্কুলের মেয়েদের চেয়ে কলেজের মেয়েরা গোলমাল করে বেশী। অথচ এখানে কিছুই বলা যায় না, ইস্কুলের মতো যায় না বেঞ্চির ওপর দাঁড় করানো, যায় না কান ম'লে দেয়া। ইস্কুল থেকে কলেজে উঠে মনে করে, কি-না-কি করে' ফেললাম, দুর্ভাগা সব! তার মেয়ে যদি হয়, সে কোনদিন তাকে কলেজে পড়াবে না। পড়িয়ে লাভই বা কি? কিছু বোঝে না, কিছু জানে না, কেবল চোখ বুজে মুখস্থ, আর পরীক্ষা খারাপ দিলে হাউ-হাউ ক'রে কান্না, ফিট্—আরও কতো কি! কিন্তু কাজের বেলায় ছ্যাখো, সব পেছনে প'ড়ে আছে।

নাচের যত পারফর্ম্যান্সই দিক্, একাই কলেজে আসুক, বেড়াক একা, এক মিনিটে হাজারো কথা বলুক, এখনও তাদের মনে পাঁচ শো, এক হাজার, পাঁচ হাজার, বলো তো দশ হাজার বছর আগেকার আদিম মনোবৃত্তি আছে বেঁচে।

অথচ পুরুষেরা এমনি বোকা যে, এ সব তারা মোটেই জানে না, ধ'রে নেয় অন্যরকম, কতো কবিতা লিখে ফেলে, দেহের রূপসাধনায় হ'য়ে ওঠে তৎপর! রমলা যদি পুরুষ হ'তো তবে দিতো সব প্রকাশ ক'রে।

রমলা হাসলো, তাহ'লে কি মজা হবে! দুর্মূল্যতা, অহঙ্কার, লজ্জা, সব চূরমার হ'য়ে যাবে।

রমলার মন আজ ভালো নেই। ব'লেছি তো, এত বিরক্তি আর অবসাদ তার কোনদিন আসেনি। দেড়টার পর একঘণ্টা লীজার। সে কলেজ-বিল্ডিংয়ের সবচেয়ে নির্জ্জন জায়গা দোতালার ছাদে যাওয়ার সিঁড়ীর কাছে যে এক টুক্‌রো বারান্দা আছে সেখানে এসে দাঁড়ালো। অন্যদিন হয়তো লাইব্রেরীতে গিয়ে বসতো, গল্প করতো প্রভাদির সঙ্গে, ভারী মজার লোক তিনি, হাসাতে-হাসাতে মারেন কিন্তু আজ তার কি হলো, সে রেলিংয়ে ভর দিয়ে, বুকের কাছে এক হাতে মার্শালের ইক্‌নমিক্স চেপে দাঁড়িয়ে রইলো চুপ করে'। নীচে কিছু দূরে দেখা যায়, গেটের কাছে বেল-গাছের ছায়ায় ব'সে কলেজের দরওয়ান কা'র সাথে গল্প করচে। ঘণ্টা পড়বার পর মেয়েরা ক্লাস বদলিয়েচে, এখনও দু'একটি মেয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বল্‌ছে।

দুপুরের দম্‌কা বাতাস মাঝে-মাঝে এসে গায়ে লাগছে; কপাল আর গালের কাছে দু'এক গোছা চুল উড়ছে বাতাসে। আকাশে ছেঁড়া সাদা মেঘ।

রমলা কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আবার কি মনে করে প্রফেসরদের বিশ্রাম-কক্ষের দিকে গেল কিন্তু সেখানে প্রভাদি নেই তাহ'লে তিনি আসেন নি, নাকি আবার প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে গল্প কর্‌চেন?

এক পাশে ব'সে নতুন-নিযুক্ত অরুন্ধতি বসু নিবিষ্ট মনে কি যেন পড়ছে। রমলা কোন সাড়া না দিয়ে নিঃশব্দে প্রিন্সিপালের ঘরে গিয়ে হাজির হলো।

প্রভাদি সত্যি আসেন নি।

প্রিন্সিপাল নির্ম্মলা রায় গম্ভীরভাবে কাগজ-পত্র দেখছেন। পাশের চেয়ারে ইংরিজীর অধ্যাপক সুধীরবাবু ব'সে আছেন, কোন কাজ আছে বোধ হয়।

রমলা চকিতে একবার সেদিকে চেয়ে বললে, শরীরটা ভারী খারাপ

বোধ হ'চ্চে নির্ম্মলা দি।

নির্ম্মলা মুখ তুলে জিজ্ঞেস করলেন, কি বললে ভাই ?

তিনি রমলাকে 'তুমি' বলেই সম্বোধন করেন, রমলার সাথে তাঁর আত্মীয়তার একটু সূত্র নাকি আছে, আর তা'ছাড়া সে কলেজের সব চেয়ে অল্প-বয়সী অধ্যাপিকা।

রমলা বললে, ভারী exhausted feel করছি।

—বোর্ডিংএ চলে যেতে চাও ?

—If you permit—

নির্ম্মলা তাড়াতাড়ি বললেন, যাও।

একটু হেসে রমলা চলে' এলো।

কলেজের লাইব্রেরী। বুড়ো লাইব্রেরীয়ান টেবিলের ওপর ভর দিয়ে বই পড়ছেন। ঘরে আর কেউ নেই।

রমলা একটা বই নেবে। বই দিয়ে সে তার ভালো-না-লাগার সময়গুলো কাটাবে।

সে বললে, শ'র কোন্ বই সব চেয়ে ভালো হবে আপনি জানেন যদুবাবু ?

যদুবাবু বললেন, আমাদের এখানে তো সব বই নেই Man and Superman ছিল, এখন লাইব্রেরীতে নেই—কে যেন নিয়েচে, Doctor's Dilemma নিতে পারেন।

—দিন তো।

যদুবাবু বই এনে দিলেন।

রমলা বই হাতে করে' বোর্ডিং-এ চলে' এলো।

দুটো বেজে গেছে। সে হাত থেকে ঘড়ি খুলতে খুলতে দেখলে।

সুমুখের জানালা দিয়ে হু হু করে' আসছে বাতাস। তারি প্রতাপে একটী পাতলা ক্যালেণ্ডার দেয়ালের সাথে ধাক্কা খেয়ে শব্দ করচে।

দুপুরের নিস্তব্ধতা চার দিকে।

রমলা জুতো ছেড়ে আয়নার কাছে এসে দাঁড়ালো।

আয়নাটী ছোট। বোর্ডিংয়ে এরকমই থাকে। কিন্তু রোজই কারণে অকারণে আয়নার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে রমলার একটী বড়ো আয়নার কথা মনে পড়ে, যাতে পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত যথাযথ দেখা যায়। কিন্তু দেয়ালে ঝুলোনো ছোট্ট ওই জাপানী আয়নায় দেহের সবটুকু দেখা যায় না। রূপ কি শুধু মুখেই !

পোষাক পরিচ্ছদ বদলাবার পর রমলা গামছা সাবান নিয়ে স্নানের ঘরে গেল। কিছু পরে হাত মুখ ধুয়ে আবার নিজের ঘরে ফিরে এলো।

গতরাত্রির বিছানা এখনও পাতাই রয়ে গেছে। টেবিলের ওপর কয়টী বই ছড়ানো। Writing padএর পাতা বাতাসে ফর্‌ফর্‌ করচে।

রমলা আবার আয়নার কাছে দাঁড়িয়ে আংশিক প্রসাধন সেরে বইটী হাতে করে' বিছানায় গা এলিয়ে দিলে। বই খুলতেই, Preface—

এক—

দুই—

তিন পৃষ্ঠা—রমলার আবার বিরক্তি এসে গেল। ক্রমাগত আরও পাতা উল্টিয়ে দেখলে, প্রায় অর্দ্ধেক বই-ই কেবল Preface। তারপরে আসল নাটক।

ওরে বাপ্‌রে !

আপনারা শুনে আরও আশ্চর্য্য হবেন, রমলা গুপ্তা এম-এ বইটী পাশে রেখে দিল। অদ্ভুত বটে !

এরকম মনের অবস্থায় আপনি আমি হয়তো ক্ষমা পেতে পারি কিন্তু কলেজের অধ্যাপিকা রমলা গুপ্তা কখনও পান না।

আমি জানি, এ আপনাদের চোখে ঠেকবে কিন্তু ঘটেছিল সত্যি ! কেন যে ঘটেছিল তা এখন খুলেই বলি।

দুবছর আগেকার কথা।

প্যাক্ট হ'লো। কেউ কারুর স্বাধীনতায় বাধা দিতে পারবে না। যদি কখনও প্রয়োজন হয়, পরস্পরে স্বামী স্ত্রীর মতো ব্যবহার করবার, তখন দু'জনের সম্মতিতেই হবে। তার আগে নয়।

পূর্ব্ব-বঙ্গের কোন এক বে-সরকারী কলেজের তরুণ অধ্যাপক অদিতি গুপ্ত চুক্তিপত্রে সায় দিলেন। রমলা তখন নূতন চাকরী পেয়েচে। তখন তার প্রাচুর্য্যের আনন্দ, নূতন জীবনের আনন্দ, যেন খোলা মাঠের বাতাস, যেন বাধা-না-পাওয়া মধ্য রাত্রির জ্যোৎস্না।

অদিতি গুপ্তের মতো মানুষ দেখা যায় না। মনে হলো, এই তার স্বামী হওয়ার উপযুক্ত। এতটুকু অভিযোগ নেই; জোর খাটাবার ইচ্ছে নেই।

কতগুলো চিঠি আছে। বিয়ের পর এগুলোই সম্বল।

রমলা আবার উঠে ডেস্ক থেকে চিঠিগুলো বার করলো। একটি সে খুলে বসলো।

চিঠির কাগজ প্যাড থেকে নেয়া নয়, সামান্য খাম থেকে ছেঁড়া কাগজ। অন্য কোনও বাহুল্য নেই; অদিতি গুপ্তের মনের একদিক এখান দিয়ে প্রকাশ পেয়েচে। কিন্তু লেখার বাহুল্য আছে; মানে, পড়তে বেশ লাগে।

সেটিতে লেখা:—রমলা, কলেজের ছাত্রদের এক সভায় শরৎচন্দ্রের নারী-চরিত্র সম্বন্ধে কিছু বলতে হবে, ছাত্রদের পক্ষ থেকে এই আদেশ এসেচে। আমার ওপর এ হুকুম। কারণ, আমি পড়াই বাংলা। যাই বলো, তুমি আছ বেশ, তোমার জীবনে ওটা কখনই লাগবে না কাজে, অন্ততঃ বক্তৃতা দিতে বলবে না কেউ।

তারপর আগের দিন রাতে প্রবন্ধ লিখে পরের দিন ব'লেছি কিছু। শুনেচি, খুব ভালো নাকি হয়েচে। আমার প্রবন্ধে এমন একটা দিক নাকি প্রকাশিত হ'য়েচে, যা' আগে-আগে কখনও দেখা যায়নি। সম্পূর্ণ অভিনব। অভিনবই বটে! নারী-চরিত্রে সর্ব্বজ্ঞ আমি। হয়তো আরও কিছু লিখলে একটা অথরিটী হ'য়ে যেতাম!—

কি যেন এক অস্পষ্ট ইঙ্গিত, মনের এক আভাষ আছে এই চিঠিতে, রমলা যেন আজ এই প্রথম বুঝতে পার্‌লো।

কিন্তু এ চিঠি আজকের নয়, অনেক দিনের, তখনকার মনের অবস্থা যা' ছিল, এখনও তাই আছে কি না, কে জানে?

রমলা বাইরের দিকে চাইলো। বোর্ডিংয়ের মাঠের পামগাছের কতখানি দেখা যাচ্ছে আর লম্বা ইউক্যালিপ্টাসের ছোট্ট পাতা বাতাসে কাঁপছে।

ফাল্গুনের বাতাস, একটু শীত করে যেন। রমলা তার একহারা পরা চাদর আরও খুলে গায়ে চেপে ধরলো। তা'ছাড়া শরীরটাও ক্লান্ত বোধ হ'চ্চে।

অদিতি বিস্ময়ে বল্‌লে, কোন খবর না দিয়েই যে!

সিঁড়ি বে'য়ে উঠ্‌তে-উঠ্‌তে রমলা বল্‌লে, ও, খবর দিইনি বুঝি?

—সেতো তুমিই জানো।

—সে কথা আগে ভাব্‌বার সময় পাইনি।

—এত কাজ! এক রকম নোটে ছাত্রীরা আর খুসী নয়, তাই অন্য অথারের বই প'ড়তে হয় বুঝি খুব?

—না, ইক্‌নমিক্স সম্বন্ধে কেউ বড় আগ্রহ প্রকাশ করে না। রমলা হাস্‌লো।

ঘরে ঢুকে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে বল্‌লে, ঘরটি বেশ পরিস্কার সাজানো তো! আমার ঘরের তুলনায় এ স্বর্গ। ইস্, তুমি যদি দেখ্‌তে—

থাক, দেখার আর দরকার নেই। মেয়েদের বোর্ডিংয়ে পুরুষের যাবার অধিকার তো নেই।

অদিতি রমলাকে হাত ধরে বসালো।

তারপর বল্‌লে, সারারাত ট্রেণের জার্নি, খুব strain হ'য়েচে, নিশ্চয়ই ঘুমও হয়নি। তুমি বিশ্রাম করো।

—না, এখন স্নান করবো। রমলা উঠে জুতো খুললো।

অদিতি বললে, তা'হলে তুমি কাপড় বদলাও, আমি যাই।

—যাও, রমলা মিষ্টি হেসে বললে, আবার এখনই এসো কিন্তু। বাথরুমটা দেখিয়ে দেবে এসে।

স্নানের পর শরীরটা বেশ ঝরঝরে হ'লো, ভালো লাগলো।

অদিতি বললে, বয়কে ডাকি। কি খাবার বলো?

—সে সম্বন্ধে আমার কোন প্রেজুডিস্ নেই; যা' ভালো হয়।

—বেশ। অদিতি খাবার ব্যবস্থা করলো।

রমলা বললে, সাহেবের হোটেল। খরচ দাও কত?

—তা কি তোমায় বলিনি রমলা? যে সংসারে অনেক ছেলে মেয়ে, এক স্বামী আর এক স্ত্রী, তাদের বুড়ো মা—বেশ চলে এ টাকায় যতো আমি দিই এখানে থাওয়া আর থাকায়। অবিশ্যি এই আমার ভালো লাগে। কোনো ঝঞ্ঝাট পোয়াতে হয় না।

রমলা বললে, মাইনের কুলোয় তাহ'লে?

—কোন মাসে কুলোয়, কোন মাসে কুলোয় না। জানো তো, আমার এক বিধবা বোন আছে, তাকে সাহায্য করতে হয়।

—জানি, রমলা এম্নি হাত দু'টো এক ক'রে বললে, কিন্তু একটা কথা বলবো—

—কি?

—বলো কিছু মনে করবে না—

অদিতি হেসে বললে, না, বলো।

রমলা বললে, আমার তো মোটেই খরচ নেই। তোমার যখন দরকার, কেন নাও না—

—চেয়ে? অদিতি আবার হাসলো।

রমলার একবার ইচ্ছে হ'লো বলে, না, চেয়ে নয়, জোড় ক'রে। কিন্তু লজ্জায় বল্‌তে পার্‌লো না।

তাকে নীরব দেখে অদিতি বল্‌লে, কি, প্রস্তাব করে' বুঝি ঠেকে গেলে? এ তো জানই—

—মেয়েদের অর্জিত টাকা পুরুষে নেয় না। কিন্তু তা তো অনেকে নেয় দেখেচি।

—না, তা নয়। আমি বল্‌ছিলুম, তা'হলে যে চুক্তি-ভঙ্গ হবে।

—ও, ব'লে রমলা একটা নিশ্বাস ফেল্‌লে চেপে।

অদিতি তার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে বল্‌লে, তুমি একটু পাতলা হ'য়ে গেছ'। খুব কি খাটুনি প'ড়েচে?

—না। বেশী পরিশ্রম আমার ধাতে কোন দিনই সইলো না, তুমি তো জানো, রমলা হেসে বল্‌লে, তবু কেমন ক'রে যে রোগা হ'লুম্ বুঝ্‌তে পার্‌চি না তো। কিন্তু তুমি টের পেলে।

অদিতি বল্‌লে, না, রোগা নয়। তুমি যেন আরও slim, আরও graceful হ'য়েছ।

রমলা নীরবে হাস্‌লো।

বয়ের হাতে খাবার এলো। টেবিলের দু'পাশে মুখোমুখী তা'রা বসলো।

রমলা বল্‌লে, তুমি খাবে না?

—বেশীক্ষণ হয়নি যে খেয়েচি, অদিতি বল্‌লে, তুমি খাও। আমি গল্প করি।

রমলা হাত গুটিয়ে বসলো :—এত খেতে আমি কিছুতেই পার্‌বো না। তুমি এসো সঙ্গে।

ভঙ্গীটা কতকটা ছোট মেয়ের আব্দারের মতো। এ পরিচয় যেন অদিতির চোখে নতুন ঠেক্‌লো।

সে হেসে বল্‌লে, আচ্ছা এসো।

খাওয়া শেষ হ'লে পর, অদিতি কৌটো থেকে একটা সিগ্‌রেট নিয়ে বল্‌লে, তোমাদের নির্ম্মলা-দি কেমন, এখনও বিয়ে করেন নি? এখনও কুমারী নির্ম্মলা রায়?

—হ্যাঁ, এখনও কুমারী নির্ম্মলা রায়। রমলা মুচ্‌কে হাসলো।

সিগারেটে আগুন লাগানো হয়নি। অদিতি তা মুখে দিয়ে এমনি ব'সে ছিল। রমলা দেশলাইএর কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে দিলে।

তা'তে একটা টান দিয়ে কতগুলো ধুয়ো ছেড়ে অদিতি বল্‌লে, তুমি ঘুমোও, সারা-রাত জেগেছ।

রমলা সত্যি বড়ো ক্লান্তি বোধ কর্‌ছিল। সে পাতা বিছানায় শুয়ে পড়লো।

অদিতি টেবিলের ওপর থেকে একটা বই নিয়ে পড়তে লাগলো।

রমলা যখন ঘুম থেকে উঠলো তখন অনেকক্ষণ বিকেল হয়ে গেছে।

রমলা চোখ রগড়িয়ে ভাবলো, সে কোথায় এসেচে? এই তো কাল ছিল একা, আর আজ? কে আছে পাশে? এ কোন্ জায়গা?

সমস্ত ঘরটীতে রমলা চাপা আনন্দে একবার চোখ বুলিয়ে নিলে। কিন্তু অদিতি ঘরে নেই। সে হাতের কাছে ছোট টেবিল থেকে ঘড়ি খুলে দেখলো, পাঁচটা বেজেছে। বেশীক্ষণ ঘুমুই নি তো তবে অদিতি গেল কোথায়?

রমলার একটু ভয় হলো যেন। খাট থেকে নেমে সে বাইরে বারান্দায় গেল। সেখানে অদিতি নেই। তার ইচ্ছে হলো চেঁচিয়ে ডাকে।

নীচে গিয়ে হোটেলের মেমগুলোকে জিজ্ঞেস করলে হয়। কিন্তু ওরা কি জানে? বারান্দার রেলিং ধরে সে ভাবতে লাগলো।

—রমলা।

রমলা চম্‌কে ফিরে তাকালো, অদিতি খালি গায়ে ভিজে কাপড়ে

দাঁড়িয়ে, কাঁধে টার্কিস টাওয়েল।

—একি?

অদিতি হেসে বললে, কাপড়-চোপড় নিতে মনে নেই।

—বাথরুমে ঢুকেও মনে হলো না?

—হয়েছিল, কিন্তু তখন অর্দ্ধেক স্নান করে' ফেলেচি কিনা।

রমলা খিল খিল করে' হেসে উঠলো। এই প্রথম সে এমনভাবে হাসলো। তারপর ঘরে গিয়ে কাপড় এনে দিলে।

একটু পরে, অদিতি ঠিক হয়ে বল্‌লে, বেড়িয়ে আসবে?

—চলো।

ডাক-বাংলো, রেলওয়ে কর্ম্মচারীদের কোয়ার্টার, পথের পাশে বড়ো লাল দালান, গাছের সারি, জনহীনপ্রায় পীচ-ঢালা মসৃণ রাস্তা।

সহরের বুকে নেমেছে ধূসর, পাতলা অন্ধকার। সারি সারি বাড়ী আর গাছপালার মধ্যে ছায়া এসেছে ঘন হয়ে।

আঁকাবাঁকা রাস্তা, সাপের মতো, কালো তার রঙ্।

বাতাসে আর দীর্ঘ সেগুণ গাছের পাতার সঙ্গে শব্দ হচ্চে মাঝে মাঝে।

পাশে, লম্বা লেক। তার পরেই অনেক দূর পর্য্যন্ত খোলা মাঠ। জলের মাঝখানে ছোট ঢেউ।

এখানে এই খোলা মাঠে, নরম ঘাসে, গাছের ছায়ায়, আকাশের নীচে বসলে পর চোখে কেমন যেন নেশা লাগে, হাত দু'টী কাকে যেন হাৎড়ায়।

অদিতি সবুজ ঘাসের ওপর পা ফেলতে-ফেলতে বল্‌লে, একটা কথা এখনও জিজ্ঞেস করা হয়নি, তুমি কেমন আছো?

রমলা হাত ধ'রে ছিল, একটু হাস্‌লো, বল্‌লে,—ভালো। তুমি?

—ছোট বেলায় কোন-কিছু হ'লেই আগে থেকেই ব'লে রাখতুম, তোমরা যাই বল্‌বে তার চেয়ে একবার বেশী আমার। এখনও তাই বল্‌ছি। তুমি

যতটুকু ভালো, তা যদি ডিগ্রী দিয়ে মাপা যায়, তার চেয়ে এক ডিগ্রী সব সময়েই আমি বেশী।

হাসি-মুখে রমলা বল্‌লে, জায়গাটা বেশ, না ?

—হুঁ কিন্তু একা নয়। আমরা দু'জনেই আছি ব'লে।

—মানে ?

—মানে, আমি আছি ব'লে তোমার ভালো লাগে, আর তুমি আছো ব'লে আমার ভালো লাগে।

অন্য সময়ে, অন্য কেউ হ'লে রমলা কর্‌তো প্রতিবাদ, কিন্তু এখন কর্‌লে না।

সে অনুভব কর্‌লে, তার হাতের মধ্যে অদিতির হাতটি আরও চেপে এসেচে।

সন্ধ্যা গাঢ় হ'য়ে এলো।

জিমখানা ক্লাবের উৎসবের বাজ্‌না শোনা যাচ্ছে;

রাত নটা। রমলা আর অদিতি হোটেলে ফিরলো।

নীচের তলায় গ্রামোফোনে মার্লিনের গান হ'চ্চে। ওপরে-ওঠাব সিঁড়ির পাশে জানালা দিয়ে দেখা গেল, কর্ম্মরত দু'তিনটে মেম্‌ আর টেবিল ঘিরে সাহেব।

ওপরে গিয়ে অদিতি চেয়ারে ব'সে পড়্‌লো আর রমলা দাঁড়িয়ে রইলো চুপ ক'রে।

অদিতি একটা সিগারেট জ্বালিয়ে বল্‌লে, কি দাঁড়িয়ে যে !

—বিছানা কর্‌তে হবে না ?

—কোথায় হবে ? অদিতি ধোঁয়া ছেড়ে বল্‌লে, জায়গা নেই তো। ওটা তো একজনের খাট। তুমিই না হয় ঘুমোও, আমি এখানে ব'সে—

রমলা একরকম চেঁচিয়ে উঠলো : তবে আমি কি কর্‌বো ? এখন গাড়ী আছে ?

—ভয় পাও কেন রমলা? এ পর্য্যন্ত আগা-গোড়া আমার স্বভাবটায় কি দেখতে পেলে, একবারটি ভেবে দেখ না! আজ রাতেই তোমাকে যেতে হবে, অসম্ভব এ কথা। অনেকদিন পর স্বামী-স্ত্রীতে দেখা হ'লে পর তা'রা রাত জাগতেও তো পারে? কি বলো? তারপর মেঝে আছে। সে কথা কি তুমি এত ভুলে গেলে যে, চেঁচিয়ে উঠ্‌লে ভয় পেয়ে? অদিতি হাসতে-হাসতে খুব কাছে এসে বল্‌লে, কি মজা, লক্ষ্য দু'জনেরই আমাদের এক হ'লেও ভাণ ক'রে তোমাকে একটু রাগিয়ে দিলাম, তোমাকে সুন্দর দেখালো, তুমি ধরা পড়্‌লে—আর—। এখন হাস্‌চো? অদিতি রমলার মুখের ওপর নত হ'য়ে তা'র পাত্‌লা ঠোঁটে একটি চুমো খেয়ে বল্‌লে, ক্ষিদে পেয়েচে বড়ো। বয়কে খবর দিই।

—না, আমার মোটেই ক্ষিদে নেই; তুমি খেলে খেতে পারো।

—তবে আমারও নেই।

—কি বলো? আশ্চর্য্যের ভাবে রমলা তাকালো, এই যে বল্‌লে—?

অদিতি হেসে বল্‌লে, মনে আছে, তোমার খাওয়ার সময়, হাত গুঁটিয়ে ব'স্‌লে—

—তারই শোধ নেওয়া হ'চ্চে বুঝি?

—হ্যাঁ

—আচ্ছা, বয়কে ডাকো। আমি হার মানচি।

খাওয়া দাওয়ার পর।

রাত্রি গভীর হ'য়ে এসেচে আর বেড়ে উঠচে তার রহস্যময়তা।

বাইরে ঘুট-ঘুটে অন্ধকার, আকাশে অজস্র তারা চোখ মেলে রাত জাগছে, আবার দিনের বেলা ঘুমুবে। গির্জ্জের ঘড়িতে বাজলো বারোটা, বাজলো একটা······

রাত্রির রহস্য গভীরতর হ'ল। তারপর একটু একটু করে ভোরের আভাস।

বাজলো বেলা আটটা।

শহরের চোখে নেশা জমে রাতে, আর ভোর হতেই সে-নেশা যায় টুটে, সুরু হয় কোলাহল, ব্যস্ততা, মোটরের হর্ণ। দিনের আলোয় মানুষগুলো মুখোস পরে।

অদিতি চেয়ারে বসে' সিগারেট খাচ্ছে। আর—রমলা শুয়ে আছে আড় হ'য়ে মেঝেয়-পাতা বিছানায়।

—রমলা।

—কি ?

—বারোটায় ছাড়বে কল্‌কাতার গাড়ী, এখন আটটা বেজে গেছে। আমার স্বভাবটা তো জানো, আপন ভোলা নই কিন্তু নিজেকে ভুলতে পারি ইচ্ছে করলে। তুমি চলে' যাও, এতটুকু জোর আমি করবোনা,—থাকো, তোমাকে ভয়ানক ভালোবাসবো—। ওঠো। না গেলে কলেজে যাওয়া হবে না, ছুটীও নাওনি। ওঠো। তোমার অনেক কাজ—

—আমাকে ঠাট্টা করো না।

—তুমি কি স্বপ্ন দেখছো ?

—হ্যাঁ, খুব ভালো একটা স্বপ্ন, আগে কখনও দেখিনি। খুব সুন্দর। আমার ভালো লাগচে। এত ভালো লাগচে যে তা তোমায় মুখে বোঝাতে পারবো না। এত ভালো, এত গভীর···

রমলার ঠোঁট চেপে আসচে, চোখের পাতা অর্দ্ধেক খোলা।

—তুমি ঘুমোও, আমি সব ব্যবস্থা করি গে।

—না—রমলা এবার যেন জেগে উঠলো, বললে, না। তুমি কোথায় যাচ্ছো আমায় একা ফেলে ?

অদিতি হেসে বললে, কেন, সম্মতির অপেক্ষা করতে হবে না কি ?

রমলাও হেসে বললে, আচ্ছা, কাল বিকেল থেকে এপর্য্যন্ত ভেবে ভাখো তো, আমার সম্মতির দিকে কতদূর চাওয়া হয়েচে ?

অদিতি বললে, বৃথাই এতদিন প্রফেসরি করলুম রমলা। অনেক আগেই এটা আমার জানা নিশ্চয়ই উচিত ছিল যে মেয়েরা মুখে কিছু বলে না, তাদের ডাকাতি করতে হয়, অর্জ্জুনের মতো হরণ করতে হয়।

—ডাকাত! জড়িমায় রমলা চোখ বুজলো আবার। তার রাত্রি এখনও শেষ হয়নি।

অমিল

অভিনয় শেষে গ্রীণ-রুমে এসে সকলে সমবেত হয়েচে ! স্থান অল্প, লোক বেশী। অভিনয় ব্যাপারে এত পরিশ্রমের পরেও অজস্র কথার গতিতে মুখের রঙ্ তোলার বা পোষাক পরিচ্ছদ বদ্‌লানোর তাড়া নেই।

স্থানস্বল্পতা স্বত্ত্বেও ঘরের এক কোণে একটু নিরিবিলি আছে। মেয়েদের সেখানে আনাগোনা কম কিন্তু ভারতী এসেই সেস্থানটুকু বেছে নিয়েছে। অত গোলমাল আর তার ভালো লাগেনা। ভারতী তাই একটা লোহার চেয়ারে চিবুকে হাত রেখে বসে মজলিস থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে চুপ ক'রে আছে।

কিন্তু কোন রকমেই রেহাই পাবার উপায় নেই। রেখা কোত্থেকে এসে ধরলো।

ইস, ভাই, তোকে খুঁজতে খুঁজতে হয়রাণ ! এমন ক'রে এক্‌লাটী বসে আছিস্ কেন বল্ তো ?

ভারতী হেসে বললে, এমনি।

তোর সবই তো এমনি, সে যাক্, একটু বসতে দে আগে, আমি আর দাঁড়াতে পার্‌ছিনে।

জায়গা কোথায় ?

একটু সরলেই হবে—কোন রকমে জায়গা ক'রে রেখা তার পাশে বসলো। রাণীর ভূমিকাভিনয়ে ছিল ভারতী। তাই জমকালো হয়ে সাজতে হয়েছিলো। রাণীর পরিধান যোগ্য অনেক ধরা-চূড়া। কিন্তু একটি জিনিষও ভারতীর নিজের নয়, সব এই-রেখার দেয়া। সে কোথায় পাবে ? মেয়েরা তাকে একদিনের জন্যও একটা ভাল কাপড় পরতে দেখেনি। তারা জানে, এর মূলে কি।

ভারতী বললে, তোর জিনিষগুলো—

রেখা আর বলতে দিলেনা, তার মুখে হাত চেপে বাধা দিয়ে বললে, ওসব কে এখন শুনতে চাইছে? এক সময় দিলেই হবে।

না দামী জিনিষ তো!

ইস্, আমি আমি পারিনে! এখানে কি এমন কেউ নাই যে আমাকে এই nonsense talk থেকে রেহাই দিতে পারে! রেখা অভিনয়ভঙ্গিতে বললো।

ভারতী নীরবে হাসলো।

ভারতীকে জড়িয়ে রেখা বললে, তোর মতো রূপও যদি আমার থাকতো তবে দেখ্‌তিস্।

কথাবার্ত্তায় রেখার প্রকৃতিই ওই রকম, সব সময় কেবল সৌন্দর্য্যচর্চা। একটু পরে বললে, থিয়েটার কেমন কেমন হলো?

দু'চার বছরেও এমন হয়নি।

খানিকটা পরে:

অঞ্জন আসবে লিখেছে।

ভারতী বললে, শুধু এই? আর কি লিখেছে বল?

লিখেছে: পাইনের মর্ম্মর ভুলতে পারো কি? আমাকে তো অনেকগুলো দিনের কথা মনে করিয়ে দেয়, তাদের ভাষায় আমি এক অতিপরিচিত ভাষাই শুনতে পাই। আমার ভালো লাগে, কিন্তু ঠিক সেই মুহুর্ত্তটাকে কি নামকরণ করবো বলো, যখন মনে হয়, যা অতীত তা তো আর আলোক নয়, সুধু অন্ধকার—

অন্যদিকে চেয়ে কতকটা স্বগতভাবে রেখা বললে, এমন সরল স্বভাব, এমন সুন্দর হাসি!

ভারতী পরিহাসছলে বললে, কালো অঞ্জন মেখেছিস চোখে! কিন্তু আমার তো হিংসে হওয়ার কথা।

তা হোক্, তাতে আমার দুঃখ নেই। কিন্তু আমার ভয়ানক খিদে পেয়েছে।

রেখা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কেন, তুই খাসনি? চা?

ওসব আমার ভালো লাগে না।

তুই একটা অদ্ভুৎ প্রাণী। চল্, এলাদির কাছে গিয়ে বলি।

ভারতী তার হাত ধরে বললে, দোহাই তোর, তুই এখান থেকে যাসনে। অত গোলমালে আমার মাথা ধরে গেছে। এখানে বেশ ভালো আছি, তুই বরং গল্প কর।

ভারতী খানিক থেমে বললে, এলে কিন্তু আমাকে দেখাবি।

আচ্ছা।

তখন আমার দুঃসময়। তুই তো আমাকে ভুলেই যাবি।

তা তুই ভাবতে পারিস, তোর মতো নেমকহারাম দুটী আছে!

ভারতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে, কি দোষটা করেছি শুনি?

দোষ? কতোদিন বললাম আমাদের বাসায় যেতে! বন্ধু বলে আমারই ঠেকা বেশী, না?

না, কে বললে অমন কথা? কখনও নয়। ঠেকা আমারই বেশী। কিন্তু তোকে আমাদের বাসায় নিইনে কেন জানিস্? সেখানে গেলে তুই শ্বাসরোধে যন্ত্রণায় মারা পড়্বি।

রেখা গম্ভীর হয়ে বললে, তুই আমাকে ঠাট্টা করিস্?

মোটেই না। জ্বলন্ত সত্য কথা।

রেখা গম্ভীর হয়েই রইলো।

ভারতী তার হাতটী বুকের কাছে টেনে বললে, কাল এক মজার ব্যাপার ঘটেছিলো। শেষ রাতে হঠাৎ জেগে দেখি, ভয়ানক বৃষ্টি হচ্ছে। ঝর্ ঝর্ একটানা শব্দ। কী যে ভালো লাগলো বলতে পারি না!

রেখা আর চুপ ক'রে থাকতে পারলো না, তারাতারি বললে, একেবারে মিলে গেছে! আমিও জেগে উঠেছিলাম কিন্তু। তোরই মতো ভালো লেগেছিলো। আর মনে হয়েছিলো, ভারতী এখন কি করছে কে জানে? এখন যদি ও থাকতো আমার পাশে, শেষরাতটুকু অনেক কথা বলে কাটিয়ে দিতাম।

ভারতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে, আমার ভাবনাও ছিল ঠিক তাই। আশ্চর্য্য তো!

রেখাদের বাসা আগে। তাই যাবার পথে নেমে পড়বার সময় তার টানাটানিতে ভারতী না গিয়ে থাকতে পারলো না।

সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে রেখা বললে, এখন রাত নটা বেজেছে, আরও দু'ঘণ্টা দেরী করে গেলে বাসায় কিছু মনে করবে না; ভাববে ইস্কুলের থিয়েটার শেষ হয়নি।

তারপর যাবার উপায়?

গাড়ী। 'আমিও যাবো সঙ্গে।

তার শোবার ঘরে বসিয়ে রেখে সে বললে, বোস্ একটু, আসি।

একটু পরে রেখা তার মাকে সাথে করে ফিরে এলো।

ভারতী উঠে দাঁড়ালো। মা বললেন, চলো মা কিছু খাবে।

ও, এই ষড়যন্ত্র করেছে রেখা! আমি খাবো না।

রেখার মা হেসে বললেন, তাহলে ভুগতে হবে কিন্তু আমাকেই। ও তো কিছুতেই খাবে না।

ভারতীকে খেতে হলো।

খাওয়া দাওয়ার পর আবার দুজনে এসে বসলো ঘরে।

একটা রাত থেকে যা ভারতী। বাসায় খবর পাঠিয়ে দি।

না না আমার কাজ আছে।

ঘরে রেডিও ছিল।

শুনবি ?

ভারতী হেসে মাথা কাৎ করলো।

কিছুক্ষণ কেটে গেছে।

একেবারে বাজে। রেখা বললে, তার চেয়ে গল্প করা ভালো।

ভারতীর কিন্তু বেশ ভালো লেগেছিল, এক মনে শুনছিলো। কচিৎ শোনার দুর্বলতায় মুখ ফুটে কিছু বলতে পারলো না।

রেখা বললে, খুব বেশী চালাক যারা, তাদের আমি দেখতে পারিনে। তারা মনে বাইরে এক নয়।

মনে বাইরে এক কেউ নয়। সে যাক্। তোর কথা শুনে যাদের তুই দেখতে পারিস্ সে বিষয়ে একটু আন্দাজ করতে পারছি বটে।

রেখা হেসে বললে, সত্যি, এমন সরল আমি আর কখনও দেখিনি !

দু'একটা প্রামাণ্য দৃষ্টান্ত শুনি আগে তারপরে তো মতের মিল হবে !

একদিন জুতো খুলে জলে পা ডুবিয়ে বসেছিলাম। ফিরে আসবার সময় অঞ্জন পরিস্কার রুমাল বার করে আমার পা মুছিয়ে দিলে, তারপর জুতো পরলাম।

আরে বাপরে, এ যে দেখ্ ছি—

চেঁচিয়ে ওঠার কোনই কারণ নেই। তারপর যা আছে শোন। আবার এমনও হয়েছে তিন চার দিন আমার সুমুখ দিয়ে অঞ্জন ওর বুড়ো ঠাকুরদার সাথে চলে গেছে, আমাকে দেখেও দেখেনি !

তোর তখন কি অবস্থা ?

কান্না পেয়েছে। রেখা হেসে দিলে।

কিছুক্ষণ পরে দশটা বাজলো।

ভারতী বললে, আমি যাই।

—এখনই ?

—বলেছি না, দরকার আছে !

তারপর নীচে নেমে গাড়ীতে গিয়ে উঠতে ভারতী বললে, সঙ্গে এসে আর কি করবি ? অনর্থক তোকে কষ্ট দেয়া।

পরের দিন স্কুলের দালানে। রাণীর উপযোগী যত কিছু পোষাক পরিচ্ছদ অলঙ্কার রেখা দিয়েছিল, আজ সব সে এনেছে। কাল যখন ওদের বাসায় গিয়েছিলো তখনই দেয়া যেতো এবং একবার বলেছিলোও কিন্তু রেখা মোটেই কান দেয়নি।

ভারতী বললে এই নাও বাপু !

এত তাড়া কিসের ? রেখা যেন অবজ্ঞায় বাণ্ডিলটায় হাত দিলো। এ দেখে ভারতী ধরে নিলো যে, অনেক আছে বলেই এ ধরণের ভাব ভঙ্গি।

সেখানে আর কেউ ছিলনা।

গয়নাগুলো প'রে ওদের তাক্ লাগিয়ে দেই কি বলিস্ ?

—আচ্ছা। কিন্তু আমি যাই, এখনই আসবো আবার। ভারতী চলে গেলো। রেখা বাণ্ডিলটা খুললো। কিন্তু কতক্ষণ পরে এসে যা দেখলো তাতে ভারতী রীতিমত ভয় পেয়ে গেল। রেখা উদ্বিগ্ন হয়ে কি খুঁজছে।

কি হয়েচে ?

একটা হার পাচ্ছিনে !

একটা ছাড়া আরও ছিল নাকি !

রেখা আশ্চর্য্য হয়ে বললে, ছিল নাকি মানে ? আমার স্পষ্ট মনে আছে।

ভারতী শুষ্কস্বরে বললে, আমার মনে হচ্ছে—

—আরে, না না, আমি কি মিথ্যে বলছি তোর কাছে ভারতী কি যে করবে ভেবে পেলো না, একটু দেখবার আশায় বাইরে গেল। একটু পরে কতকগুলো মেয়ে এসে জুটলো।

কি হয়েছে রে ?

রেখা সব বললে।

একটী মেয়ে মুচকি হেসে আস্তে বললে, আমার ঠাকুরমা একটা কথা প্রায়ই বলেন, অভাবে স্বভাব নষ্ট। যদিও সকলের বেলায় তা নয়।

রেখা বললে, অন্য কিছু হলে আমার আফশোষ হতো না, কিন্তু জিনিষটা বিলেতের গোল্ড স্মিথ কোম্পানীর, দাদা এনেছিলেন। তাই দুঃখ হয়। কি যে করি এখন?

কি আর করবে? আরও ভাব করো'গে।

এমন সময় ঘরে এসে ঢুকতে ভারতী কিছুটা শুনে ভয়ে আর বিস্ময়ে বিবর্ণ হ'য়ে গেল। এমন যে হবে সেটা সে কখনও ভাবতে পারেনি। তবু সে অনেকগুলো কৌতুহলী দৃষ্টির সামনে গিয়ে বললে, বাসায় একবার খুঁজে দেখিস্ না ভাই—

এত ভুলো মন নয় আমার। আর এই তো প্রমীলাও তো দেখেছে। অন্য জিনিষ হলে আমি কিছু বল্‌তাম না কিন্তু এ যে—আর এতই যদি টাকার দরকার ছিল, আমি কি চাইলে দিতে পারতাম না?

ভারতী একবার প্রতিবাদ করতে চাইলো কিন্তু গলা দিয়ে স্বর বেরুলো না।

কিন্তু পরের দিন এর চেয়েও বেশী আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটলো।

রেখা এসে হাত ধরে বললে, তোরই কথা সত্যি হলো, বাসায় সেটা পেয়েছি। কিন্তু তোকে অনেক কষ্ট দেয়া হলো, আমার অন্যায় হয়ে গেছে!

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে আসার মতো যেন ভারতী অনুভব করলো। মুখে বললে, ব্যাপারটা খুব হাস্যকর বোধ হচ্ছে।

হ্যাঁ। তুই আমাকে মাপ কর ভাই!

ক্ষমা কাকে বলে তা আমাদের মতো লোকের জানবার কথা নয়, তার অর্থও ভাল ক'রে বুঝিনে, আরও অনেক জিনিষ না বোঝার মতো!

রেখা ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে চেয়ে রইলো।

ভারতী বললে, কিন্তু এটা একাধিকবার প্রমাণিত হলো যে, বড়োলোক এবং গরীবে এমনি খুব দরকার বোধে গম্ভীর আবহাওয়ার মধ্যে কথাবার্ত্তা হয়তো চলতে পারে কিন্তু ভাব যাকে বলে, মানসিক ঘনিষ্ঠতা যার নাম, তা কখনও হতে পারে না।

কেন?

কেন, তার অনেক কারণ। প্রধান কারণ হলো, একপক্ষ নিজের অবস্থা সম্বন্ধে একজন সম্রাটের চেয়েও বেশী সচেতন।

কথাটা হয়তো সত্যি নয়।

তুমি কিছু মাত্র দ্বিধা না করে আমাকে সকলের কাছে চোর বলে চালিয়ে দিলে কি মনে করে?

ভুল হয়েছিলো বলেই তো!

এ একটা হাস্যকর কথা, ধনীদের সস্তা অজুহাত।

বললামই তো, ভুল।

আবার সেই কথা! ভারতী উষ্ণ হ'য়ে বললে, এই যে সকলে চোর বলেই জানলো, আমার দারিদ্র্যের সুবিধা নিয়ে অনেক ধারণাই করলো, তার কি হবে, কি কৈফিয়ৎ দেবে তুমি? আমাদের আত্মসম্মান নেই? না, সেটা তোমার ওই পেন্সিল কাটা জাপানী কলের চেয়ে সস্তা?

এখন ব্যাপারটা যখন সত্যি নয়—

সত্যি নয় কে বললে? এখন কারুর কাছে গিয়ে আমি যদি বলি, প্রাণের চেয়েও প্রিয় একটি মেয়ে আমার বন্ধু ছিল, এমন ভাব বোধ হয় কোনখানেই দেখা যায় না। কিন্তু এক দিন একটা হার চুরি যাওয়ায় সেই মেয়েটিই আমাকে চোর বলতে একটু ভেবে দেখলো না, অমনি আমার কথা বিশ্বেস করবে বলো? আমাকে পাগল ছাড়া আর কিছু ভাববে? ভারতী রাগে লাল হয়ে বললে, আমার সাথে তুমি কথা বলো না। ঘৃণা জিনিষটাকে আমি খুবই ঘৃণা করতাম কিন্তু এখন একটু দরকার বোধ করছি।

সে আর কিছু না বলে সে জায়গা ছেড়ে চলে গেল।

সত্যবতীর বিদায়

শীতের এক সুগভীর কুয়াশাচ্ছন্ন ভোর বেলায় অত্যন্ত ময়লা কাপড় দিয়ে বাঁধা একটা পুটুলি হাতে করে এক বৃদ্ধা, রাজকুমার রায়ের প্রকাণ্ড ফটকওয়ালা বাড়ীর ভিতরের উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। প্রথমে ঢুকতে একটু দ্বিধা করেছিলো, কারণ এই বাড়ীতে সে এই প্রথম পদার্পণ করছে, কিন্তু মুহূর্ত পরেই সমস্ত দ্বিধা কাটিয়ে এক নিঃসংকোচ কলেজ বালিকার মতোই চাকর-বাকরের ছুটোছুটি আর কোলাহলে কাতর উঠোনের মাঝখানে এসে দাঁড়ালো। বৃদ্ধার চেহারা এমন কদাকার যে হঠাৎ দেখলে ভয় হয়। উঁচু কপাল, তুবড়ানো নাক, মাংসল মুখ অথচ চোখ দুটি অত্যন্ত ছোটো এবং গর্তে বসানো। মাথার চুল ছোটো করে ছাটা, বয়স পঞ্চাশের বেশি হলেও গায়ের চামড়া এখনো যথেষ্ট ঢিলে হয়ে আসেনি।

বৃদ্ধা কারুর আশায় এদিক ওদিক চেয়ে শেষে একটা চাকরকে ডেকে বললে, আচ্ছা, এটা আমাদের রাজুর বাড়ী না ?

রাজু! রাজু কে ? এই বলে চাকরটা আবার নিমেষে কোথায় উধাও হয়ে গেল।

রাজু কে ? তবে কি এটা রাজুর বাড়ী নয় ? বৃদ্ধা মনে মনে খানিকটা অসহায় বোধ করলো, কিন্তু বাইরে সে ভাব সম্পূর্ণ ঢেকে রেখে আর একজনকে ডেকে বললে, আচ্ছা, এটা আমাদের রাজুর বাড়ী নয় ?

ঝি মতির মা খন্ খন্ করে বললে, রাজু-টাজু কেউ এখানে নেই গো !

কিন্তু এমন সময় ভেতর থেকে মনোরমা বললে, কে রে মতির মা ? এই বলে আর মতির মা'র উত্তরের অপেক্ষা না করে ধীরে ধীরে ভারী শরীরখানা নিয়ে বাইরে এসে দাঁড়ালো। তার চোখে চশমা, হাতে অনেকগুলি চুড়ি,

গায়ে আটো-সাটো সেমিজ চওড়া নক্সি পেড়ে শাড়ী। বুড়ীকে দেখে মনোরমা আশ্চর্য্য হলো, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সেই বিস্ময়ের ভাব দমন ক'রে ফেললো, বরং চোখের ওপর ভ্রূ কুচকে এসেছে।

এক গাল হেসে সত্যবতী বললে, বৌ, কেমন আছো? আচ্ছা, তোমাদের কতোকাল দেখিনে! তোমাদের কথা ভেবে-ভেবে হয়রাণ হয়ে গেলুম, ঈশ্বরকে কতো বলি, ঠাকুর, আমার এমন ছেলে, ছেলের বৌ সব থাকতে আমি ষাটের বুড়ি কেন এত কষ্ট করে মরি? ছেলে তো আমার এমনও নয় যে কক্‌খনো ডাক-খোঁজ করে না। আমার রাজুর মতো ছেলে কারুর হয়? কক্‌খনো হয় না, এই আমি বলে দিচ্ছি। এই তো সেবার এক দুই তিন চার·· সত্যবতী হাতের কড়গুণে বললে, পাঁচটা টাকার জন্যে দু-অক্ষর লিখে পাঠিয়ে দিলুম, আর অমনি তোমায় কি বলবো বৌ···আর অমনি যেন হাওয়ার গাড়ীতে চড়ে টাকা এসে হাজির! বলতে-বলতে সত্যবতীর দম বন্ধ হয়ে এলো।

ইতিমধ্যেই প্রায় সারা বাড়ীতে সাড়া পড়ে গিয়েছিলো; বাড়ীর সমস্ত ছেলেমেয়েরা—মণ্টু-ঘেণ্টু-জিতু-বেলা-হেলা ইত্যাদি সবাই এসে বুড়ীকে ঘিরে দাঁড়ালো। সকলের ছোট জিতু এই কুৎসিত বুড়ীকে আর কখনো দেখেনি, সে মনোরমার আঁচল ধরে নাকী সুরে বললে, কে ঠাকুর মা?

সত্যবতী হাসতে হাসতে হাত বাড়িয়ে বললে, আয় ভাই আয়। তোদের নাম কি রে ভাই? আরে আয় না! না এই রাজকন্যের মতো সুন্দরী বৌকে দেখে পছন্দ হচ্ছে না? সত্যবতী একটু পরিহাস করলো। ওদিকে মনোরমার শীতলতাও তার দৃষ্টি এড়ায়নি। সে তাকে খুশী করবার জন্যে বললে, তোমাকে ভারি শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে বৌ। কোনো অসুখ করেছে বুঝি?

মনোরমা সংক্ষেপে গম্ভীর স্বরে বললে, না কোনো অসুখ করেনি।

ওপরের পড়ার ঘরে বসে ইন্দু প্রাণপণে কলেজের পড়া মুখস্থ করছিলো। নতুন মানুষের সাড়া পেয়ে বারান্দার ওপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে বললে, মা কে এসেছে ?

মা একবার ওপর দিকে চাইলো মাত্র, কিছু বললে না। সত্যবতী চোখ বড়ো করে বললে, বৌ, আমি বলে দিচ্ছি, তোমার কোনো অসুখ করেছে, তুমি না করলে আমি শুনবো কেন ? দাড়াও, আমি ওষুধ দিয়ে দেবো। সত্যবতী বছর দুই আগে নাকি কালী পেয়েছিলো, তাঁর আশীর্বাদে একটা মূল্যবান ওষুধও পেয়েছিলো এবং সত্যবতী মনোরমাকে অভয় দিলো।

মণ্টুরা একেবারে হা করে তার দিকে চেয়ে ছিল, এমন কদাকার চেহারা তারা ইতিপূর্বে আর কখনও দেখেনি। ছবিতেও এরকম চেহারা খুব কম দেখা যায়। দাঁত যা-ও আছে তা-ও এমন কালো যে দেখলে ঘেন্না করে। ঠোঁটের কোণ বেয়ে কী যেন পড়ছে।

কিন্তু ছাই পোড়াকপাল আমার,—সত্যবতী বলা-নেই কওয়া-নেই হঠাৎ কপালে করাঘাত করে বললে, হা ঈশ্বর ! যার জন্য এতদূর এলাম তাকেই ভুলে গিয়েছি। রাজু কোথায় বৌ, আমার রাজু ?

মনোরমা বসবার ঘর দেখিয়ে দিলো।

সত্যবতী তর্ তর্ করে অমনি সেই ঘরের দিকে ছুটলো, পুটুলিটা কোথাও রাখবার জায়গা এখনো হয়নি, আর রাখবেই বা কোথায় ? কোথাও এতটুকু পরিষ্কার জায়গা আছে কি ? সেটা কাঁখে করেই সত্যবতী বসবার ঘরে ঢুকলো, কিন্তু ছেলের চেহারা দেখে তার দুই চক্ষু স্থির, আহা কী চেহারা কী হয়েছে গো ! ননীর শরীর যেন পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। সেই তকতকে সোণার বরণ রঙই বা কোথায়, মাথার সেই গভীর কালো চুলই বা কোথায় ? রাজকুমার চেয়ারে বসে অনেক খাতাপত্র দেখছেন, সামনেই দুটি চেয়ারে বসে আরও দুটি লোক। সেই লোকগুলির সামনেই সত্যবতী হাউ মাউ করে

কেঁদে উঠলো চোখের জলে বুক ভাসিয়ে বললে, রাজু, তোর এই কী চেহারা হয়েছে বাবা? তোর এমন অসুখ, আমায় আগে জানাসনি কেন? কেন জানাসনি বল? আমি কি তোর কেউ নই? ঈশ্বরকে কতো বলি, হে ঠাকুর, সবই তো দিয়েছো, তবে আর একটি মনোবাঞ্ছা যদি পূর্ণ করতে! আজ উনি বেঁচে থাকলে!

ব্যাপারটা প্রথমে রাজকুমার ভালো করে বুঝতেই পারেনি হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো। একটু পরে লজ্জায় আর রাগে মাটির সংগে মিশে গেল। সত্যবতীকে দুই হাত দিয়ে ধরে সে বললে, আহা, এখানে কেন মা? এখান থেকে যাও, অন্য সময় হবে। সে সত্যবতীকে ঘরের বার করে দিলো। সত্যবতী তখনো শিশুর মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছিলো, এক হাতে পুটুলিটা ধরে আর এক হাতে কাপড়ের আঁচল নিয়ে নাক-চোখ মুছতে লাগলো।

দুর্ধর্ষ শক্তিমান কোনো লোককে কাঁদতে দেখলে যেমন হাসি পায়, এই কুৎসিত বুড়ীকেও শিশুর মতো ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদতে দেখে মণ্টুদের হাসি পেলো, তারা খিল্ খিল্ করে হাসতে লাগলো।

এই দেখে সত্যবতীর রাগের আর সীমা নেই!—আহা, হাসচিস কেন? আমরা গরীব বলে মানুষ নই বুঝি?

মনোরমা আর সহ্য করতে পারলো না। বললে, দেখতেই তো পাচ্ছেন, কয়েকজন ভদ্রলোক বসে আছেন ওঘরে, তবু ওখানে গিয়ে ওদের সামনে ওরকম করেছেন কেন? মনোরমার রাগ হলো, সারা জীবনে যিনি একটি দিনের জন্যও খোঁজ করেন না, তাঁর হঠাৎ এমন উৎসাহ দেখলে সত্যই হাসি পায়। সত্যবতী, রাজকুমারের পিতা নবকুমারের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী। তার বিবাহের ইতিহাস বড়োই বিচিত্র। রাজকুমারের মা মারা যাওয়ার বছর পাঁচেক্ পরে হঠাৎ একদিন ভয়ানক বাবু সেজে নবকুমার কোথায় উধাও হয়ে গেল, সাত-আটদিন পরে সংগে করে নিয়ে এলো এই দুর্ধর্ষ সত্যবতীকে। সত্যবতী

তখনো এমনি কালো বটে, কিন্তু কিছুটা মার্জিত, চকচকে, হঠাৎ দেখলে চোখ ঝলসে যায়। তার প্রশস্ত শরীর তখন দিগন্ত-বিস্তৃত মাঠ, ধূ ধূ করে। নবকুমার তখন এই রসসিক্ত শরীরটাকে পেয়ে চুলে প্রচুর কলপ মেখে বাইরের পৃথিবীর সংগে সম্পর্ক ছিন্ন করে দিলো।

কিছুকাল পরে আবিষ্কার করা গেল, সত্যবতী কেবল সত্যবাদীই নয়, কিঞ্চিৎ মুখরাও বটে। গ্রামের ভিতর তার শত্রুসংখ্যা হু হু করে বেড়ে যেতে লাগলো। সত্যবতী নিঃসংশয়ে এটা সিদ্ধান্ত করলো যে সমস্ত পৃথিবী তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে। তারপর অনেকগুলি বছর কেটে গেছে এবং সমস্ত পৃথিবীর বিরুদ্ধে একলা সংগ্রাম করে এতকাল বেঁচে থাকা যথেষ্ট শক্তিমত্তার পরিচয় বটে। নবকুমার এই স্ত্রীলোকটিকে বিয়ে করবার পর থেকে মৃত্যুর আগে পর্যন্ত একদিন ভুলেও ছেলের খোঁজ করেনি—লোকে শুনে অবাক হয়ে যায়, বাস্তবিক, মানুষ এমন পাগল হয় কী করে? শত হলেও নিজের ছেলে তো! মনোরমার অভিযোগ এইখানেই, তার ভ্রূ কুচকে এসেছে এই কারণেই। সে তার বড়ো মেয়ে জয়ন্তী এবং পুত্রবধূ সুনন্দার কাছেই প্রথমে ব্যাপারখানা সবিস্তারে খুলে বললো, শেষে এই বলে উপসংহার করলো যে এমন দরদ দেখালে হাসির বদলে কান্নাই পায়!

কিছুক্ষণ পরে ঘর ঝাট দিতে গিয়ে এক নতুন বিভ্রাট এসে হাজির। কেমন একটা পচা গন্ধ পেয়ে সত্যবতী নাকে কাঁপড় দিলো, দূর থেকে উকি ঝুঁকি মেরে দেখলো, ঘরের অন্ধকার কোণের দিকটিতে একটা চড়াই মরে পড়ে রয়েছে। আ রামো! এমন কাণ্ড তো জীবনেও দেখিনি! সত্যবতী অমনি দৌ'ড়ে মনোরমার কাছে গেল, গিয়েই একদমে বললে, বৌ, তুমি জেনে-শুনে যে এমন একটা কাণ্ড করবে তা আগে জানিনি।

মনোরমা সেদিনের বাজারের হিসেব লিখছিলো, চাকর সামনে দাঁড়িয়ে, চশমা-শুদ্ধ ভারী মুখখানা তুলে চোখদুটো বরাবর সত্যবতীর চোখের ওপর স্থাপন করে সে বললে, কী হয়েছে?

সত্যবতী হাত-পা চোখ-মুখ সব একসংগে নেড়ে হতাশার সুরে বললে, হবে আবার কি ! যা হবার তাই হয়েছে । একটা চড়াই মরে পড়ে রয়েছে ঘরে। বৌ, তুমি বেছে-বেছে এমন একটা ঘর কেন আমায় দিলে বলো তো ? আমার রাজ্যির তো ঈশ্বরের ইচ্ছেয় আর ঘরের অভাব নেই !

মনোরমা বিরক্ত হয়ে বললে, কে বললে আমি আপনাকে ওরকম একটা ঘরে ইচ্ছে করে থাকতে দিয়েছি ? এই বলে একজন চাকরকে ডেকে চড়াইটা বাইরে ফেলে দিতে নির্দেশ দিলো।

(২)

তখনো ভালো করে সন্ধ্যা হয় নি। এই সময়টা দিয়ে সমস্ত বাড়ীটা ভোরবেলার গোলমালে ভরে যায়। ঝি উনান ধরাতে যায়, ঠাকুর মনোরমার কাছে এবেলা কী-কী রাঁধবে সে বিষয়ে পরামর্শ করতে আসে, আর বৈকালিক চা-পান এখনো যাদের হয়নি তাদের শিশু-সুলভ চিৎকারে বাড়ীর এদিক ওদিক ধ্বনিত হয়ে ওঠে।

এমন সময় বারান্দার আব্ছা অন্ধকারে কয়েকটি ছোটো-ছোটো ছেলেমেয়েকে চুপ-চাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সত্যবতী উৎসাহিত হয়ে ডাকলো, কে রে ? বেলা ? শোন্ ?

বেলার দল খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো, একটা দৌড় দিয়ে খানিকটা পালাবার চেষ্টা করে আবার যথাস্থানে ফিরে এলো, বুড়ীর দিকে পিট্ পিট্ করে তাকাতে লাগলো।

শুনে যা বলছি ? আহা, ছেলেবুড়ো সবাই একরকম ! শুনে যা ? ছোটো ছেলেমেয়ের দল এবার সাহস করে সত্যবতীর ঘরের ভিতর ঢুকলো, দম বন্ধ করে বললে, কেন ডাকছো, বুড়ী ?

বুড়ী ! সত্যবতী এক মুহূর্তে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠলো, তাদের তেড়ে বললে, আমি বুড়ী নাকি ? বজ্জাত ছেলে, ধরে-ধরে কান মলে দেবো ? যার তার সংগে ইয়েকিঁ, না ?

বেলারা আবার দমে গেল, এখন কী করবে ভেবে না পেয়ে এ-ওর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে অন্ধকারে ঘুর্ ঘুর্ করতে লাগলো। এ-দেখে সত্যবতীর মায়া হলো, তাদের ডেকে বললে, ফের ওরকম করিসনে, বুঝলি? বুঝলি তো? হ্যাঁ, তোর নাম কী রে? কী বললি? হেলা? সত্যবতী হেলা নামের ছোটো মেয়েটিকে কোলের কাছে টেনে বললে, আচ্ছা হেলা, তোরা কখনো ভূত দেখেছিস?

ভূত? না!

আমি দেখেছি! সত্যবতী এমনভাবে হাঁসলো যেন কোন ভূতের মতোই দেখায়; বললে শোন্ তাহলে বলি। সেদিন শনিবার, পশ্চিম পাড়ার ঘোষ বাড়ীতে শনিপূজার নেমন্তন্ন ছিল, তাই সকাল-সকালই যাচ্ছিলুম। মাত্র সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, কিন্তু এরি মধ্যে পথে লোকজন নেই। গাঁ-দেশের পথ-ঘাটের কথা তো জানিস্, কটা লোকই বা হাটে। সেই রাস্তা দিয়ে যেতে একটা জায়গা ছিল যেখানে গাছ-পালা ঝোপ-জংগল এত বেশী যে দিনের বেলাতেই অন্ধকার হয়ে আসে, বাঁ দিকে একটা তেঁতুল গাছ আছে, কবে কোন ঝড়ে উপ্ড়ে পড়ে রয়েছে, তবু আজও মরেনি, বছর বছর দিব্যি পাতা গজায়, তেঁতুল গজায়। এই তেঁতুল গাছের কাছে গিয়েই গা আমার ছম্ ছম্ করতে লাগলো, আমি জোরে হাটতে লাগলুম, কিন্তু ভাই, পথ আর ফুরোয় না, হাটছি-হাটছি-হাটছি-পথ আর ফুরোয় না, যতোই হাটি না কেন পেছন দিকে চেয়ে দেখি সেই তেঁতুল গাছ। ভাবতে লাগলুম, এবার কী করা যায়? ঠিক এখুনি তো মন্তরটা আওড়ানো আর ঠিক হবে না, একবার হারালে ও-মন্তর আর ফিরে পাওয়া যায় না। এমন সময় দেখি, আমার পথ আগলে সেই···! সত্যবতী মুখে উচ্চারণ না করে আকারে ইংগিতে বললে, বুকের ওপর থু থু ফেললো—এই প্রকাণ্ড···! তালগাছের মতো তার দুটি ঠ্যাং, মিশ মিশে কালো শরীর। ওপরের দিকে ভয়ে ভয়ে চেয়ে দেখলুম, তার গায়ে

নেই আমাদের মতো কোনো মাথা, নেই গলা, কেবল বুকের ওপর বড়-বড় দুটি চোখ, আগুনের মতো জ্বল্ জ্বল্ করছে! আমি তো ভয়ে হিম্‌সিম্ খেয়ে গেলুম, শরীরের ভিতর ঘাম দিয়ে জ্বর এলো, হাত-পা ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে লাগলো···সত্যবতীর ছাইরাঙা দুটি চোখ বড়ো হয়ে এলো, সে সকলের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন সেদিনের ভয়ে ছায়াগুলি আজো তার চোখের সুমুখে ভূতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে। আর মণ্টুরা? তাদের চোখও বিস্ফারিত, তারা ভয়ে ভয়ে এদিক-ওদিক চেয়ে সত্যবতীর হাঁটুর ওপর হাত রেখে বসে রইলো।

গল্প যখন শেষ হলো তখন রাত নটা বাজতে আর বাকি নেই। সত্যবতী অনেক গল্প করলো, মুখের জল ফেনা হয়ে গেছে, তার কুঞ্চিত পেটের ঘর-খানায় আরও গল্প আনাগোণা করে। সত্যবতী আশ্বাস দিলো, সেসব কাহিনী সে আরেক দিন বলবে—আজ আর নয় বাপু, আজ আর নয়!

ঠাকুমা, ভয় করছে যে!

ভয় কিসের? ভারি তো ভয়! কয়লার টুকরোর মতো কয়েকটি দাঁত বের করে সত্যবতী হাসে।

মণ্টু বয়োজ্যেষ্ঠ। সকলের বড়ো হয়ে পাছে নিজের দুর্বলতা অতর্কিতে প্রকাশ পায়, এই ভয়ে সে নিজের চঞ্চল দৃষ্টি যথাসম্ভব গুটিয়ে ওপরে যেতে-যেতে বিজ্ঞের মতো বললে, ভয় কিসের! আমার হাত ধরে চলে আয় হেলা।

বেশি রাত হয়নি। রান্নাঘরে এখনও রান্নার আয়োজন চলছে। বাসন আর খুন্তি নাড়ার টুং টাং শব্দ, ঝি-চাকরের চেঁচামিচি, ওপরে ইন্দুর পড়া মুখস্থ করা, মনোরমার ছেলের ঘরে প্রথম যে ছেলেটি হয়েছে তার অবিশ্রান্ত চিৎকার। মেয়েটা বড়ো কাঁদে। মনোরমার বড়ো ছেলে বাইরে অনেক রাত কাটায়, বড়ো ফ্লাশ খেলার বাতিক, বাতিক শুধ্‌রে যাবে এই ভেবে তাড়াতাড়ি বিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, কিন্তু শুধলো কই? ওদিকে দোতলার

রেলিং বেয়ে কয়েকটা কাপড় ঝুলছে, বেশির ভাগই শাড়ী। আশ্চর্য্য, এত লোক-লস্কর থাকতেও এমন ব্যাপার! কেবল পড়া মুখস্থ করলে আর গান শিখলেই হবে? সত্যবতী একটা প্রকাণ্ড হাই দিলো, সংগে-সংগে দুটি আংগুল দিয়ে টক্ টক্ শব্দ করে তুড়ি দিতে ভুললো না। তার হাই দেওয়ার অর্থ এই নয় যে সে এখনি ঘুমোতে যাবে, এমনি ঘন-ঘন হাই দেওয়া তার একটা অভ্যাস; তাতে সে বেশ আরাম বোধ করে। সত্যবতী উঠে দাঁড়ালো, ঘোম্‌টা টেনে বাইরে গিয়ে থপ্ থপ্ করে ওপরে উঠতে লাগলো, সিড়িগুলি এত প্রশস্ত এবং বেশি যে যেন একটা মরুভূমি চিৎ হয়ে শুয়ে আছে—অস্ফুটস্বরে সে বললে, কত সিড়ি বাপু, যেন আর ফুরোবে না!

দোতলার পেছনের ছাদে কে এই রাতে ঘুরে বেড়াচ্ছে? কাছে গিয়ে দেখা গেল, জয়ন্তী। মরা ঘাসের মতো শুকনো জয়ন্তী এই রাত্রেও দিব্যি চুল ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

সত্যবতী আশ্চর্য্য হয়ে বললে, ওমা গো, এই অমাবস্যার রাত্তিরেও চুল ছেড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিস? তোদের কাণ্ড দেখে গা বমি বমি করে! জানিস, রাত্তিরে চুল ছেড়ে ঘুরে বেড়ালে কী হয়?

জয়ন্তী অত্যন্ত যত্নের সংগে কোনো একটা মধুর বিষয় ভাবছিলো, এমন নির্মম আঘাত পেয়ে তীব্র দৃষ্টিতে তার দিকে চাইলো, কিন্তু দেখলো, তার দুটি চোখ আগুনের মতো জ্বল্ জ্বল্ করছে।

সত্যবতী হতাশ হয়ে বললে, ওমা গো, আমি কোথায় যাবো?......... তার খারাপ লাগলো এই ভেবে যে দিনকালের গতি আগের মতো আর নেই, ঠাকুর-দেবতা তো মানবেই না, এমন কি অমাবস্যার রাত্রেও যে চুল ছেড়ে ঘুরে বেড়ানোটা মোটেই ভালো নয়, এ-ও মানবে না। এই তো সেবারও ঘোষবাড়ীর পারুল—সে বলবে সেই ঘটনা? আর বললেও তো বিশ্বেস করবে না! সত্যবতী নিজের মনে বিড়্ বিড়্ করতে করতে নীচে নেমে

নেমে এলো, তখনি দরজা দিয়ে শুয়ে পড়লো। কিন্তু সকালে ঘুমালে যা হয় আর কি, মধ্যরাতে জেগে উঠে সত্যবতী বাইরের বারান্দায় কার জুতোর মচ্ মচ্ আওয়াজ শুনতে পেলো, বললে, কে?. কে? কিন্তু কোন উত্তর নেই। জুতোর আওয়াজ সিড়িতে উঠে আবার আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেল। মনোরমার বড়ো ছেলে প্রিয়কুমার এতক্ষণে বাড়ী ফিরছে।

(৩)

পরদিন সুদীর্ঘ এক ঘণ্টাকাল স্নানের পর বারান্দা ধরে নিজের ঘরে যাবার সময় এমন একটা ঘটনা ঘটলো যাতে সত্যবতী একটা তুমুল কাণ্ড বাধিয়ে তুললো। ব্যাপারটা তেমন কিছুই নয়, ঝি মতির মা'র কাপড়ের আঁচলটা তার সদ্যস্নাত শরীরে হাওয়ার মতো একটু এসেছিলো মাত্র। সত্যবতী অমনি হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলো! আ—মর মাগী, ছুঁয়ে দিলি যে? কেন ছুঁয়ে দিলি বল্? ওমা গো, আমায় ছুঁয়ে দিলে গো! আমি এইমাত্র চান করে এলাম, আর অমনি ঝি-মাগী আমায় ছুঁয়ে দিলো! আবার বলে কিনা, আমরা ছোটলোক নই গো, অদেষ্ট মন্দ বলেই আজ ঝি-গিরি করে খাই! বলে কিনা কায়েত, কায়েত না আরও কিছু, ও-কথা বললেই আমি বিশ্বেস করি।

মতির মা বিশেষ শ্রদ্ধা সহকারেই বৃদ্ধার পায়ে ধরে প্রণাম করতে যাচ্ছিলো, কিন্তু এমন ঝাম্‌টা খেয়ে হতভম্ব হয়ে গেল, এবারের মতো নিজের জাতের উচ্চতা আর বিশেষ করে প্রমান না করেই ধীরে ধীরে সরে পড়লো।

কিন্তু প্রণাম করতে না দিলেও এমন অবজ্ঞাও আবার সহ্য হয় না। সত্যবতী একে নিতান্ত অবজ্ঞা বলেই ধরে নিলো, ক্ষ্যাপা কুকুরের মত আরও খেউ খেউ করতে লাগলো।

এমন সময় দোতালার বারান্দা থেকে উঁকি মেরে মনোরমা বললে, আহা

অত চেঁচামিচি কেন ? বাড়ীর মধ্যে একটা অসুখ হলেও এক মিনিট শান্তিতে থাকবার যো নেই ? তোমরা সবাই মিলে কি ক্ষেপেছো ? ইন্দু, ওখানে দাঁড়িয়ে কেবল হাসচিস্ যে ? এলি ? রতন, এখনো দাঁড়িয়ে রয়েচিস ? ডাক্তার ডাকতে গেলি ?

ডাক্তার ! আবার ডাক্তার ডাকা কেন ? কার আবার অসুখ করেছে ? সত্যবতী খানিকটা শুনেই স্তব্ধ হয়ে গেল, মনে-মনে ভাবলো, কার আবার অসুখ হলো ? মনে হচ্ছে তার রাজুরই কিছু····· ? সত্যবতী অমনি তার বর্তমানের বিষয়টি ভবিষ্যতের জন্য স্থগিত রেখে একটি তেজস্বিনী ঘোড়ার মতোই ছুট্‌তে ছুট্‌তে ওপরে গিয়ে হাজির হলো, শুনতে পেলো রাজকুমার বলছে : আমি আর কী করবো বল ? এক ছেলে জুয়ো খেলেন, আর এক ছেলে স্বদেশী করেন, আর এক মেয়ে বিয়ে করতে চান না, আর এদিকে তো ভাড়ার ঘর শূন্যি, ঋণে গলা পর্যন্ত ডুবে গেছি ! লোকে তাদের ছেলেপেলের আশা কেন করে ? বুড়ো বয়সে অকর্মণ্য হয়ে গেলে বসে-বসে খাবে বলেই তো ? আর আমার ঘরে এসব কী !

সত্যবতী বুঝতে পারলো, রাজকুমার কিছুক্ষণের জন্য ভারী অস্থির হয়ে পড়েছে। হবেই তো, এত বড় একটা সংসার ওই একটা লোকের মাথায়ই তো ! সত্যবতী ঘরের ভিতর ঢুকে হাউ মাউ করে কেঁদে উঠলো, বললে, রাজুরে, তোর এ কী হলো বাবা ? আমায় আগে বলিসনি কেন ? শত হলেও তো আমি তোর মা, মা'র কাছে সব কথা আগে বলতে হয় !

সকলে অবাক। মনোরমা হতবুদ্ধি।

সত্যবতী বিনিয়ে-বিনিয়ে বললে, হে মা কালী, ছেলেকে আমার ভালো করে দাও, আমার রাজু ভালো হলে জোড়া পাঠা বলি দেবো, আমার ছেলেকে ভালো করে দাও ! এতদিন ধরে এসেছি, মা'র সঙ্গে দেখা করবার নামটি নেই, আমার ওপর রাগ করবে না, তো কি ! মাগো, তোমার কাছে কতো

অপরাধই না করেছি, তাই বাছার আমার এমন অসুখ করেছে। তোমার দুটি পায়ে ধরি মা, বাছাকে আমার ভালো করে দাও! সত্যবতীর দুই চোখ দিয়ে দর্ দর্ করে জল পড়তে লাগলো, চোখের জলে বুক ভেসে গেল। কান্নার বেগ খানিকটা কমলে সে সকলকে এই বলে আশ্বাস দিল যে মা কালীর কৃপায় সে তার রাজুর অসুখ এক ঘণ্টার মধ্যে সারিয়ে দেবে।

সত্যবতীর এই উচ্ছ্বাসে কিছুমাত্র বিস্ময় প্রকাশ না করে সকলে যে যার কাজে মন দিলো, মনোরমা তার দিকে একবার তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে তারপর স্বামীর প্রতি মৌখিক পরিচর্যার শর নিক্ষেপ করলো।

রাজকুমার ওঠার চেষ্টা করে বললেন, আহা, এত গোলমাল কেন? কিছু হয়নি, আমার কিছু হয়নি, তোমরা যাও, আমায় একটু একা থাকতে দাও! উঃ! রাজকুমার তার কপালে হাত চেপে চুপ করে বসে রইলেন।

কিন্তু এমন অবজ্ঞা কখনো সহ্য হয়? সত্যবতী ভাবলো, সে যে কালী পেয়েছে, একথা কে না জানে! বরং একথা শুনে এবাড়ীর লোকগুলি হয় কিল্‌বিল্ করে হাসবে, নয়তো গম্ভীর হয়ে বসে থাকবে। বিশ্বেস করতে যেন অহংকারে বাঁধে! অথচ এজন্যই গ্রামে তার কত আদর, তাকে নিয়ে কতো ডাকাডাকি, কতো লোক ডাক্তারকে ফেলে রাজুর মা'র কাছে ছুটে আসে। অথচ এরা বিশ্বেস করে না! কলিকাল না হলে এমন হয়! সত্যবতী মনে-মনে দারুণ বিরক্ত হলো, এত বিরক্ত হলো যে মনে-মনে এদের প্রতি ঈশ্বরের অভিশাপ কামনা করতে লাগলো। যারা অহংকারে মত্ত হয়ে লোককে এমন অবজ্ঞা করে, তাদের সংগে কথা না বলাই ভালো। সত্যবতী ধীরে ধীরে নীচে নেমে এলো। এখন রান্না করে' কিছু খেতে হবে তো! পেট যখন আছে তখন পেটের ভিতর কিছু দিতেই হবে।

বাইরে একটা কাক ডেকে উঠলো, কা! কা!

সত্যবতী তাড়া দিয়ে বললে, আ-মর আবার এখানে এসে পড়ে মরেচিস

কেন? যা, এখান থেকে যা! হুশ্, হুশ! এদের দেখলে সত্যবতীর বুকের ভিতর কাঁপুনি ধরে যায়।

বিকেলবেলা ইস্কুল থেকে ফিরে মণ্টু এসে হাজির। সংগে বেলা-হেলা-জিতুরাও। মণ্টু বললে, ঠাকুমা, আপনি মিথ্যে কথা বলেছেন। আমাদের স্যার আজ বললেন ভূত বলে কিছু নেই।

সত্যবতী অবাক হয়ে গেল, দুই চোখ পাকিয়ে বললে, স্যার কে শুনি?

আমাদের যিনি ইংরেজী পড়ান। আমায় খুব ভালোবাসেন।

বলেছে ভূত-টুত কিছু নেই?

হ্যাঁ।

সত্যবতী ঠোঁট উল্টিয়ে বললে, হুঁ, কথায় বলে······কিন্তু হঠাৎ দারুণ গম্ভীর হয়ে গেল, নিজের দুই চোখে আংগুল দিয়ে বললে, আমি এই স্বচক্ষে দেখেছি! তাহলে বলি শোন।

সবাই তাকে ঘিরে বসে গেল, বেলা ঠাকুরমার বিছানার ওপর হাটু গেড়ে বসলো। সত্যবতী তার তুবড়ানো বিকৃত মুখ আরও বিকৃত করে বললে, আমি স্বচক্ষে দেখেছি। দুই বছর আগের কথা বলছি। সেবার একটা পাখি আমার ঘরের উঠানের সামনে এসে দাঁড়ায়। পাখিটা দেখতে এমন সুন্দর ছিল যে কী বলবো, দু'চোখ জুড়ে যায়, মনে হয় আরও দেখি। দেখতে পেলুম, পাখিটা রোজই আমার উঠানে এসে বসে, দু'হাতে রূপের হাট খুলে এদিক-ওদিক হাটে। দেখতে-দেখতে আমার ভারি ইচ্ছে হলো ওকে একবার ধরি, পাখীকে ইচ্ছে হলেই হাত বাড়িয়ে ধরা যায় না, তবু কেন ইচ্ছে হলো ওকে একবার ধরি। অমনি হাত বাড়িয়ে দিলুম, হাত বাড়িয়ে দেখি, পাখি তো উড়ে পালিয়ে গেল না, কেবল একটু সরে দাঁড়ালো। ভাবলুম একনটি তো কখনো হয় না! আবার হাত বাড়িয়ে ধরতে গেলুম পাখি আবার সরে দাঁড়ালো। আবার ধরতে গেলুম, আবার সরে

দাঁড়ালো! বুঝলি মণ্টু 'আমি যেন পাগল হয়ে গেলুম, পাগলের মতো ওর পেছনে-পেছনে ছুটতে লাগলুম—সত্যবতীর চোখ বড়ো হয়ে গেল, সে তার গলার স্বর কাঁপিয়ে-কাঁপিয়ে বললে, অনেকক্ষণ পরে চেয়ে দেখি, আমি একটা বনের মধ্যে এসে পড়েছি, আর আমার সামনে সেই পাখি, বনের মধ্যে একটা জনমানব নেই. ঘর নেই বাড়ী নেই, টু শব্দটি নেই, কেবল আমি আর সেই পাখি, আমার হাত-পা অবশ হয়ে এলো, আমি কাঁদতে লাগলুম—সত্যবতী সত্যই কেঁদে দিলো, তার দুই চোখ বেয়ে দর্ দর্ করে জল পড়তে লাগলো। মণ্টুদের অবস্থা এর চেয়েও খারাপ। ভয়ে তাদের দাঁতগুলি যেন লেগে গিয়েছে, চোখ বেরিয়ে এসেছে। সত্যবতী বললে, একটু পরেই চেয়ে দেখি, পাখির জায়গায় পাখি তো নেই, শাদা কাপড় পরে' এত বড় ঘোমটা টেনে এক বৌ, বৌ আস্তে-আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এলো, আমার তখন পেটের নাড়ি-ভুড়ি পর্যন্ত কেঁপে উঠেছে, আমি তখন বুদ্ধি করে এক দৌড় দিলুম, তারপর অনেক দূর এসে তবে বাঁচলুম! আবার বলে কি না বিশ্বেস করে না! বিশ্বেস তোর মাষ্টারের ঘাড়ে করবে। তোদের মাষ্টারের ভারি অহংকার হয়েছে, না রে? সত্যবতী আঁচল দিয়ে চোখের জল মুছলো।

সন্ধ্যার অন্ধকারে কেউ কারুর মুখ দেখতে পাচ্ছিলো না, মণ্টু তো চোখ বুজেই রইলো, একজন যে উঠে সুইচ্ একটু টিপে দেবে, এমন সাহসও কারুর নেই। মণ্টু চোখ বুজেই বললে, আলোটা জ্বালিয়ে দে না, বেলি? ইস্ কী অন্ধকার! আলোটা জাল্ না?

আমি পারবো না বলছি। নিজে যেতে পারো না?

হেলার অবস্থা আরও সাংঘাতিক। সে দাঁত মুখ খিঁচিয়ে অনেক কষ্ট করে যতোই ভূতের চেহারাটা ভুলতে চেষ্টা করছিলো ততোই সেই ভূত নামক জীবটি একটা বিরাট আকার ধারণ করে তার চোখ ঘিরে দাঁড়াচ্ছিলো। সে অবশেষে কাঁদতে সুরু করে দিলো: ঠাকুমা, ও ঠাকুমা!

ঠাকুরমার চোখের জল তখন শুকিয়ে এসেছে।

ব্যাপার আরও অনেক দূর গড়াতো, যদি না মনোরমা জানতে পারতো। হঠাৎ একদিন শেষ রাত্রে মণ্টু অনেক অস্পষ্ট কথা বলে বালিশে মুখ ঘষে গোঙাচ্ছে। অনেক কষ্টে সেদিন তাকে সেই গোঙানি থেকে বাঁচানো গেল, তার পরের দিনও মণ্টুর যা চেহারা হয়ে গেল দেখলে কান্না পায়। আর সর্বদাই কেমন পাকিয়ে পাকিয়ে তাকায়, যেন সর্বদাই ভয়ে হিম্‌সিম্ খাচ্ছে। সন্ধ্যা হলে অবস্থা আরও জটিল। তখন সকলেই মনোরমার আঁচল ধরে বসে থাকে, কিছুতেই ছাড়বে না।

পরদিন মনোরমা সত্যবতীর ঘরের দিকে ছুটে গেল। সত্যবতী তখন জয়ন্তীর দৈহিক দুর্দশার কথা নিয়ে ঝি মতির মা'র সংগে গভীর আলাপে রত। মনোরমা বললে, আপনি এসব কী সুরু করে দিয়েছেন শুনি? ছেলেপেলে বলেও একবার মায়া হয় না? আমাদের কি মেরে ফেলবেন?······এতটুকু মান-সম্মান জ্ঞান নেই। গেঁয়ো ভূত!

ভূত!

সত্যবতী অবাক হয়ে মনোরমার দিকে চাইলো, তার দিকে হা করে চেয়ে রইলো। যে কোনো মুখভঙ্গিতেই তাকে এমন বিকৃত দেখায় যেন মনে হয় সর্বদাই সে রেগে রয়েছে: ছোটো পোড়া কপালের নিচে জলভরা চোখ দুটি বাঘের চোখের মতো জ্বল্ জ্বল্ করে, ওপরের পাটির কালো দুটি দাঁত নিচের ভারী ঠোঁটের গায়ে বারে-বারে আঘাত খেতে থাকে, যেন একটা কালো চকচকে মেশিন, হাস্‌ফাস্ করে চলছে, দম আট্‌কে রেখে মাঝে-মাঝে শ্বাস ফেলছে।

তারপর এক পরিচ্ছন্ন ভোরবেলায়—বাড়ীর একটা লোকও তখনো ঘুম থেকে ওঠেনি, কিন্তু দূরে বড়ো রাস্তায় ট্রাম-বাসের শব্দ প্রবল হয়ে উঠেছে—সত্যবতী তার কালো ইস্পাতের মতো শরীরে একখানা নামাবলী জড়িয়ে মাথায় নববধূর মতো প্রকাণ্ড ঘোমটা টেনে, নিজের ছোট পুটুলিখানা কাঁধে

স্থাপন করে পথে বেড়িয়ে পড়লো। এমন দুঃসাহসিকতার অভিনয় সে তার জীবনে আরও অনেক করেছে, স্বামীর মৃত্যুর পর গ্রামের বিপুল শত্রুসংখ্যার সংগে একা যুদ্ধ করেছে, তখন আত্মরক্ষার্থে কতো দুঃসাহসিক কাজে তাকে লিপ্ত হতে হয়েছে। আজও তার অন্যথা হতে পারে না। রাজপথে পড়ে' সত্যবতী যাকে কাছে পেলো তাকেই জিজ্ঞেস করলো: হ্যাগা, শেয়ালদায় কতো নম্বর বাস যায় বলবে?

এমন কোলাহলভরা রাজপথে সত্যবতীর কণ্ঠস্বর ভারি ক্ষীণ শোনা গেল। সে বাসের কণ্ডাক্টরদের জিজ্ঞেস করলো, হ্যাগা, তোমাদের বাস শেয়ালদায় যাবে?

সিগারেট

যাদব ঠিক করিল, সে আজ একটা সিগারেট খাইবে। বিবাহের আগে মাঝে-মাঝে তুই-একটা সিগারেট সে খাইত বটে, কিন্তু তারপর এতগুলি বছর আর ছুঁইয়াও দেখে নাই, আজ ঠিক করিয়া ফেলিল, যত দামই হোক, সিগারেট আজ একটা সে খাইবেই।

বড় রাস্তার রেলওয়ে ক্রসিংএর গেটের সঙ্গে লাগিয়া যে ছোটো দোকানটা বসে, সেখানে সব রকম সিগারেটই থাকে। যাদব ধীরে ধীরে সেদিকেই চলিল। গিয়া দেখিল, দোকানের মালিক গোকুল সেখানে নাই, হয়তো খাইতে গিয়াছে, একটা ছোড়া বসিয়া আছে সেখানে। পান সাজানোর চক্চকে থালাটার উপর তুটি পয়সা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া যাদব বলিল, একটা সিগারেট দে তো?

যুদ্ধের ফলে সব সিগারেটেরই দাম চড়িয়া গিয়াছে, ছোড়াটা বলিল।

তা হোক, যাদব তবু একটা সিগারেট কিনিয়া ফেলিল, অত্যন্ত সাবধানে সেটা তুই ঠোঁটের মাঝখানে চাপিয়া সে তা' ধীরে ধীরে ধরাইয়া জোরে একটা টান দিল, তারপর কিছুদূর হাটিয়া দেখিল, রেলওয়ে ক্রসিংএর ওইদিকে লাইনের পাশেই শীতের রৌদ্রের নীচে খোলা জায়গাটিতে গোল হইয়া বসিয়া মাধু সর্দার, ইয়াসিন, শঙ্কর আর সুকুমার গল্প করিতেছে, তাহাদের আজ তুপুরবেলা কারুরই ডিউটি নাই। সিগারেট-মুখে যাদবকে দেখিয়া তাহারা সকলেই এক সঙ্গে হৈ হৈ করিয়া চেঁচাইয়া উঠিল।

ইয়াসিন বলিল, আরে, মস্ত বাবু হয়ে গেলে যে যাদববাবু! শঙ্কর বলিল, এসব কী? বুড়ো-বয়সে আবার ফূর্তি জাগলো কেন?—বুড়া যদিও যাদব এখনও হয় নাই, তবু তাহাকে এমন একটি কথা শঙ্কর না বলিয়া পারিল না।

সুকুমার রেলওয়ে ইউনিয়নের সেক্রেটারি। সে বলিল, তাই তো বলি যাদববাবু কোথায় গেল? ইউনিয়ন অফিসে একেবারেই পাত্তা নেই কেন? আপনার ওপর কী ভার দেয়া হয়েছিল, মনে আছে তো?

একসঙ্গে কতকগুলি ধোঁয়া মুখে নিয়া যাদব হাসিয়া উঠিল। তাহার হাসির সঙ্গে সঙ্গে রুদ্ধ ধোঁয়াগুলি কুণ্ডলী পাকাইয়া বারে-বারে তীব্রবেগে বাহির হইয়া আসিতে লাগিল।

আর সকলেই বিড়ি খাইতেছে।

তাহার সিগারেটের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টে চাহিয়া থাকিয়া তারপর সুকুমার বলিল, এই সিগারেট দেখে আমার তিরীশ সালের কথা মনে পড়ছে। সে আরম্ভ করিল, তখন গান্ধী বিলিতি-বর্জনের আন্দোলন আরম্ভ করেছেন। আর কি, সে-সময় তো এদেশের ধনীদের পোয়াবারো! তাদের ব্যবসা দিন দিন ফেঁপে উঠলো, তার লভ্যাংশ দিয়ে তারা নতুন ব্যবসা খুললো। এদিকে দিশী কতোরকম বিড়ি যে বেরিয়ে গেল তার হিসেব নেই। যারা কোনদিন সিগারেট ছাড়া খান না, তারাও বিড়ি খেতে আরম্ভ করলেন। তখন কাউকে সিগারেট খেতে দেখলে, তার ওপর এমন ঘেন্না হতো যে তা' বলবার নয়। ইচ্ছে হতো, বিলিতি বর্জনের মতো তাকেও বয়কট করি, বা জ্বালাময়ী ভাষায় খুব কয়েকটি কথা শুনিয়ে দিই!—সুকুমার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, প্রাণ ভরিয়া কিছুটা হাসিয়া নিয়া আবার সে বলিল, তখন আমি একটা লোককে জানতাম যার স্বভাবই ছিল, সকলে যা করতো তার ঠিক উল্টো করা। সকলে যদি ঠিক করলো, হরতাল করবে, সে অমনি বাজার করে আসতো। সবাই যদি ঠিক করলো, এবার বিলিতি আর পরবে না, অমনি দেখা গেল, খাঁটি বিলিতি কাপড়ের জামা পরে দিব্যি সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তেমনি সবাই যদি ঠিক করলো, সিগারেট আর খাবে না, চেয়ে ত্থাখো, সে দারুণ সিগারেট খেয়ে বেড়াচ্ছে। কিন্তু এবার আর কিছুতেই রেহাই

পাবার যো-টি নেই। তাকে সিগারেট খেতে দেখে সবাই তাকে বয়কট করলে, এমন কি, কথা পর্য্যন্ত বন্ধ করে দেয়া হলো। সত্যি এমন শাস্তি আর দেখিনি! সুকুমার হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল, প্রাণ ভরিয়া হাসিতে লাগিল।

অদূরে গেটম্যান গেট বন্ধ করিয়া দিয়াছে, এখনই গাড়ী আসিবে বোধ হয়। ইষ্টিশনের প্ল্যাটফর্মে কুলিদের অল্পবিস্তর ব্যস্ততাও চোখে পড়ে। দূরে যাদবদের যে সারি সারি কোয়ার্টার দেখা যায়, একটি দীর্ঘ খেজুর গাছের নীচে তাহাদের নিতান্তই নিরীহ বলিয়া মনে হয়।

হাসি থামিলে সুকুমার আবার বলিল, আবার এমনি আর একটা লোককেও দেখেছিলাম, যাকে একদিন দেখি, ছোটো-ছোটো ছেলেপেলেরাও ঢিল ছুঁড়ে মারছে!

ঢিল ছুঁড়ে মারছে?

হ্যাঁ! —সুকুমার আবার তেমনি হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল।

শঙ্কর হঠাৎ চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, যাদব দা, সিগারেটটা ফেলে দাও, ফেলে দাও বলছি!

সকলে বিস্ময়ভরা দৃষ্টিতে যাদবের দিকে তাকাইল।

শঙ্কর আবার বলিল, ওটা আর খেয়ো না, খেয়ো না, ফেলে দাও বলছি! —শঙ্করের চোখে-মুখে আতঙ্ক, স্বর উত্তেজিত।

যাদব হতভম্বের মতো সিগারেটটা নীচে নামাইয়া বলিল, কেন?

শঙ্কর বলিল, দেখছো না, ওটা কেমন হয়ে গেছে, কী যেমন বেয়ে পড়ছে!

সকলে দারুণ আতঙ্কে জ্বলন্ত সিগারেটটার দিকে চাহিয়া দেখিল, হ্যাঁ, ঠিকই, কেমন একটা বিশ্রী কালো পদার্থ সিগারেটটার বাকী অংশটুকুর গা বাহিয়া পড়িয়াছে। যাদবও দেখিল। হাতের আঙ্গুলগুলি তাহার ভয়ে আর উত্তেজনায় কাঁপিতেছে।

শঙ্কর বলিল, ওটা বিষ।

বিষ !

হ্যাঁ, বিষ। মুখে গেলে আর বাঁচতে হবেনা। আমি এক সাহেবকে দেখেছি, তারও এমনি হয়েছিলো, কী যেন বেয়ে পড়ছিলো সিগারেটের গা বেয়ে, সে অমনি ওটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো। যাদবদা, ওটা খেয়ো না, ফেলে দাও বলছি, ছুঁড়ে ফেলে দাও !

যাদব আর দ্বিরুক্তি করিল না, সিগারেটটা দূরে ছুঁড়িয়া মারিল। হাতটা তাহার এখনও কাঁপিতেছে।

কিন্তু সিগারেটটা ?

অর্ধেকও খাওয়া হয় নাই যে ! যাদবের মনটা খারাপ হইয়া গেল, সে চুপ করিয়া রহিল।

লাইনের কিছু দূরে দীর্ঘ ঘাসে ভরা মাটিতে সিগারেটটা জ্বলিতেছে, আর সেই দীর্ঘ ঘাসের ভিতর হইতে একটা শাদা মসৃণ ধোঁয়ার রেখা পাকাইয়া-পাকাইয়া উপরের দিকে উঠিতেছে। মনে হয়, লক্‌লকে ঘাসের ওই তীক্ষ্ণ ডগাগুলিও সিগারেটের ধোঁয়ার বিষে জর্জরিত ; তাই কম্পমান।

গান

শীলাবতী যেন অপূর্ব সুন্দরী হইয়া উঠিয়াছে—বিশেষত আজিকার দিনটীতে। এক বছর ধরিয়া অশোক তাহাকে দেখিয়াছে, আজও দেখিল। দেখিল : শীলাবতী ঘামিয়া উঠিয়াছে ; কপালে, সরু চিবুকে, গলার নীচে, বুকের কাছটিতে ছোট ছোট ঘাম-বিন্দু। ডান হাতটি ছন্দোবদ্ধ ভঙ্গিতে লীলায়িত, গালের পাশে অবিন্যস্ত উড়ো চুল।

রান্নাঘর। একপাশে একটিমাত্র জান্‌লা—অপরিসর ; সারাটা ঘর একটু আগেও ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন ছিল, এখনও আছে, কিন্তু গভীরতায় অল্প।

অশোক দুই হাত তুলিয়া বলিয়া উঠিল : আহা দেখেছো, সব নষ্ট করে দিলে, সব দিলে নষ্ট করে। অমন মাছটা আর খেতে পেলাম না।

খুন্তি নাড়্‌তে নাড়্‌তে, হাসিয়া শীলাবতী বলিল : আহা ! নিজের চরকায় তেল দাওগে বাপু, রান্নাঘরে কেন পুরুষের ঝকমারি ! টাকা যদি তোমরা আন্‌তে পারো, রাখ্‌বার উপায়টা আমরা জানি, তোমরা নও। তোমরা যদি গাছ—মানে কাঠ কাট্‌তে পারো, আমরা জালাতে পারি আগুন।

—এবং জ্বালিয়ে জ্বালিয়ে দিব্যি আরামে, পায়ের ওপর পা তুলে ঘুমোও। ওদিকে তো পুরুষের দোকানে ঘিয়ের বাতী।

হাসি চাপিয়া শীলাবতী যেন হঠাৎ গম্ভীর হইয়া ওঠে। বলে : তাই নাকি ? তাহলে উপায় ?

অশোকও গম্ভীর হইয়া বলে : এক কাজ করো। কিছুদিন তোমরাই এখন দোকান সাজাও ; আমরা ঘরে এসে বসি।

খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া ওঠা শীলাবতীর অভ্যাস। হাসির বেগে

চোখ দুটি ছোট হইয়া আসে, গাল ফুলিয়া ওঠে, চিবুকের উপর কয়েকটি রেখার দাগ পড়ে।

অশোক তার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। খুসীর প্রাবল্যে শীলাবতীর মুখখানা কি রকম হইয়া আসে দেখিয়া তৃপ্তি অনুভব করে। তার পর অকস্মাৎ গম্ভীর হইয়া গেল, দারুণ গম্ভীর।

দুইজনেই চুপ চাপ ; কেবল খুন্তি নাড়ার ঠুং ঠাং শব্দ, তার সংগে হাতের চুড়িতে অনুচ্চ আওয়াজ।

ঘাড় কাৎ করিয়া গালটা এক পাশে উঁচাইয়া ধরিয়া শীলাবতী ভুরু কুঁচকাইয়া বলে : কি হলো ?

—কেবলই মনে হচ্চে, কাল্‌কেই যে চলে যাবো।

—হাঁ। শীলাবতী গাল নিচু করিয়া নিল।

—হাঁ মানে ?

—একেবারেই সোজা কথাটি। মানে, আবার আস্‌বে।

—আস্‌বো ! —যেন অশোকের মতো জলমগ্ন প্রায় হতভাগ্য একটা ভাসন্ত তৃণ দেখিতে পাইয়াছে।

শীলাবতী মাথা নাড়িয়া বলিল : হ্যাঁ, শীতের ছুটিতে।

—ও, এই কথা ? সে তো আমিও জানি। —অশোকের চোখে মুখে যেন হতাশার চিহ্ন।

শীলাবতী এবার নিজের সংগে কথা বলে : তোমাদের কিন্তু মজা মন্দ নয় ; সহরে থেকে গাড়ী-ঘোড়া দৌড়াও, কতো কিছু দেখো, কত কিছু খাও, আবার মুখের চোখের স্বাদ বদ্‌লাতে চ'লে এসো গাঁয়ে। কী মজা !

অন্য সময় হয়তো অশোক হাসিমুখে অন্য কথাই বলিত, যোগ্য উত্তর ছিল। কিন্তু এখন তেমনই গম্ভীরভাবে, ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল : তুমি আমার সংগে যাবে শীলা ?

শীলাবতীর মুখ ঘুরিয়া আসিল : কোথায় ?

—যেখানে কতো কিছু দেখি, কতো কিছু খাই।

তৎক্ষণাৎ মুখ অন্যদিকে ঘুরিয়া গেল : ছিঃ !

তা'র কাঁধে হাত রাখিয়া অশোক বলিল : ছিঃ কেন ?

—পাগ্লামি কোরো না। তোমার মা নেই বোন নেই ? তা'রা মানুষ নয় ? তা'রা এখানে পড়ে থাক্‌বে—আর আমাকে একলা নিয়ে যাবে তুমি ?

অশোক হাত সরাইয়া নিল। চুপ করিয়া সামনের উঠানের দিকে তাকাইয়া থাকা ছাড়া গত্যন্তর কোথায় ? কিছুক্ষণ পরে আবার কি মনে করিয়া নিজেই বলিল : আমার দোষ ? তুমিই তো বল্‌লে !

—বল্‌লাম বলেই বুঝি যেতে চাইলাম ? শীলাবতী সশব্দ হাসিয়া উঠিয়া বলিল : হা ঈশ্বর ! সে কথা তুমিও জানতে, ওটা পাগ্‌লামি। তবু তো বললে, ব'লে আবার নিজেই দুঃখু পেলে ! না বাপু, অমন হাঁড়িপনা মুখ আমি সইতে পারিনে, অত রাগ আমি ভালোবাসিনে। —এই বলিয়া সে একটু পিছন ঘুরিয়া অশোকের ডান হাতটি নিজের হাতে নিল। মুখ নিচু করিয়া নিজের বুকে চাপিয়া ধরিল।

তারপরেই খিল্‌খিল্ করিয়া দুজনেরই উচ্ছ্বসিত হাসি।

এমন সময় বাহিরে দ্রুত পদশব্দ এবং কাশি। সংগে সংগে ডাক : ভূতো, ভূতো ?

নিমেষ মধ্যে হাত ছাড়িয়া দিয়া স্খলিত ঘোমটা মাথায় তুলিয়া শীলাবতী রান্নায় মন দিলো। যেন ভালো মানুষটি। বিরক্তির সুরে অশোক বলিল : তোমায় তো কতোবার বলেছি মা, ও নাম ধরে আমায় ডেকো না, ডেকো না ; তবু তোমার কি যে খেয়াল, কিছুতেই ও নামটি ছাড়্‌বে না। যেন জিদ্ ক'রে বসে আছো। আড়ালে শুনে লোকে ভাববে, লোকটা বুঝি সত্যি ভূতের মতো দেখ্‌তে !

শ্বাশুরীর উপস্থিতি জানিয়াও আর চাপিতে না পারিয়া শীলাবতী খুক্ খুক্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। হাসিতে গেলে শীলাবতীর খোঁপাসুদ্ধ মাথাটা কাঁপিতে থাকে।

আঁচলটা খসিয়া গিয়াছিল। সেটা আবার কোমরে জড়াইতে জড়াইতে মাথায় শুক্‌নো খড়ের মতো দুই গাছি চুলকে একটা গুটির মতো পাকাইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত এবং ত্রস্ত নিরুপমা বলিলেন : ভূতো! দেখ্ দিকিন্, কাজের সময়ই যতো ঝক্‌মারি!

—ঝক্‌মারি!—অনিচ্ছাসত্বেও অশোক বলে।

—তা নয় তো কি? যতো বলি, ব্যাটা যেন আরও চেপে বসে। আমি বলি, বাপু আমি তো আর কত্তা নই, যিনি কত্তা তাকে জিজ্ঞেস ক'রে এসো। বলে, তা' হলে ডেকে দিন। আমার দুহাত ভরা কাজ, আমি নাকি পারি অতদিকে নজর রাখ্‌তে? ঝক্‌মারি!

কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অশোক বলিল, কিন্তু লোকটা কে?

—কি জানি! ও নাম বল্‌তে আমার দাঁত ভাঙে, আমার মনে থাকে না বাপু। সেই যে পশ্চিমপাড়ার বুড়ো সর্দার!—নিরুপমা নাম মনে করিতে চারিদিকে তাকাইলেন।

কে? আশ্রফ্ মিঞা?

—হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই সর্দারই বলে কি না, শুধু আপনি বললেই হয় ঠাক্‌রুন্, আমরা এবার ভাসান শোনাবোই। আমি বলি বাপু আমাকে কেন? কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি—নিচু হয়ে গলার স্বর নামাইয়া নিরুপমা বলিলেন, চমৎকার গায় ওরা। লখিন্দর যে ছেলেটা সাজে, আহা কী সুন্দর চেহারা, কী গায়ের রং! আর ঐ যে সর্দার, ওর যা গলা, শুন্‌লে বাকি্যহারা হতে হয়। চমৎকার!—আবার গলার স্বর স্বাভাবিক করিয়া বলিলেন, বলি আমাকে ধরে কি হবে? টাকা পয়সার মালিক তো আর আমি নই!

খুসী হয়ে অশোক বলিল, তা হলে বলে দাও গে মা।

—আজই তো? কাল্‌কে তো চলে যাবি। যাই তা' হলে, কথা দিয়ে দিইগে।—বলিয়া নিরুপমা দ্রুতপদে তাহার চারিদিকের ঝামেলা পোহাইতে চলিলেন।

মুখ টিপিয়া শীলাবতী হাসিতেছিলো। ঘোম্‌টা তুলিয়া দরজার দিকে চাহিয়া বলিল: ভাগ্যিস্‌ নিজের চোখে দেখেছিলাম, তা নইলে ঐ নাম শুনে কে আর বিয়ে ক'রে!

পরম উৎসাহে অশোক সায় দিয়া কহিল, এই দেখো ঐ জন্যে কতোবড়ো একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারতো। তুমি আজ অন্যের হয়ে যেতে পারতে; ইস্‌, কতো বড়ো একটা ফাঁড়ার হাত এড়ানো গিয়েছে।

—নাকি? খিল্‌খিল্‌ করিয়া শীলাবতী আবার হাসে।

বিকালের খানিকটা আগে হইতে উদ্যোগপর্ব সুরু হইল। সর্দার নিজে তদারক করে। মাথার উপরে টাঙানোর জন্যে নৌকার পাল; বসিবার জন্যে একটা ছোট সতরঞ্চি, দরকার হইলে তক্তা পাতিয়া দেওয়া যাইবে। এই ভাবে সারাটা বিকাল কাটিল। অশোকের ছোট বোন অরু ও পাড়ার ছেলেমেয়েরা উৎসুক দৃষ্টিতে অসামান্য খুশী নিয়া দেখিতেছে। সর্দারের মুখটি আজ কী পরিষ্কার, পালিশ, চক্‌চকে। চুলে সাবান দেওয়া হইয়াছে; আজ আর তেল চপ্‌চপ্‌ নয়, আজ তার ঘাড় পর্যন্ত বড়ো বড়ো চুল রেশমের মতো নরম আর হাল্‌কা।—বাতাসে ফর্‌ ফর্‌ করিয়া উড়িতেছে। যাই বলো, সর্দার এককালে সুন্দরই ছিল। আজ নয় বুড়া হইয়াছে; কিন্তু যাই বলো, লখিন্দরের মতো অমন জোয়ান-মদ্দর মা'র পার্টে তাহাকে মানাইবে ভালো; বেশ মানাইবে।

নিজেদের বসিবার জায়গা করিয়া লইতে আর কতোটা সময়ই বা লাগে!

কোন্ এক মুহূর্তে নিরুপমা অরু আর শীলাবতী বসিয়া পড়িয়াছে, সস্তা হারমোনিয়ামের রীডে অনভ্যস্ত আঙ্গুলের চাপ পড়িয়াছে, অশোক তাহা ভালো করিয়া খেয়ালই করে নাই।

ভাসান গানে কথা কম, গান বেশি। মিনিটের কাঁটা লক্ষ্য করিয়া সর্দার ভাসান শোনায় না। তাই, যখন সবে মাত্র সনকা লখিন্দরকে বিদেশে যাইতে বারণ করিয়াছে, তখনই রাত এগারোটা।

অশোক হঠাৎ উঠিয়া দাঁড়াইল ও আড়চোখে চাহিয়া দেখিল,—একপাশে আরও কয়েকটি বৌ এবং অরুর পাশে শীলাবতী গুটিসুটি বসিয়া আছে, তন্ময় হইয়া পালাগান শুনিতেছে। সকলের সামনে তাহার মা।

অশোক আপন মনেই যেন সরবে বলে: ইস্ রাত হয়েছে অনেক, শুয়ে থাকি গে।

কেউ সাড়া দিলো না, এমন কি ফিরিয়াও তাকায় না। এমনই তন্ময়।

অশোক খানিক বসিলো; একটু পরেই আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। বলিল: কাল ভোর না হতেই তো আবার দৌড়তে হবে ইষ্টিশান। নাঃ শুইগে যাই।

এবার কেবল অরুই ফিরিয়া তাকায়। চোখে তাহার অশেষ করুণা! অন্য কাহারও কানে কি কথাটা যায় না? অশোক উচ্চারণ করে: ইস্, যে না গান, তা আবার এত মনোযোগ দিয়ে শোনা? আমার তো কেবল হাসিই পায়! হাসি পায় বলিয়াই বুঝি অশোক একবার হাসিবার চেষ্টা করে।

এবার লখিন্দর নিতান্তই অবাধ্য হইয়া বিদেশযাত্রা সুরু করিবে। রাত তখন বারোটা।

নাঃ, অসহ্য। অশোক আবার দাঁড়ায়।—"এই জিনিষ দেখেই যদি সারাটি রাত জাগতে হয়, তবে তার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কী আছে? শেষ

কি আর এখন হবে, হবে সেই বেলা দশটায়—হুঁ, আমি জানি বলেই তো শুতে যাচ্ছি। ব্যাটাদের তো আর খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, বেলা দশটা অবধি ভাসান-যাত্রা!"

অরুর সত্যি অশেষ করুণা—এক মা'র পেটের বোন তো! সে তার দাদার দিকে মিট্‌ মিট্‌ করিয়া তাকায়। ঐ তো, অতটুকু মেয়ে, ঘুমে ঢুল্‌ছে, তবু ঠায় বসিয়া সমস্তটা দেখা চাই-ই! মেয়েদের তো ওই দোষ। চোখ কট্‌মট্‌ করিয়া অশোক তার দিকে তাকাইতেই ভয়ে ভয়ে অরু মুখ ফিরাইয়া লইল।

আর না দাঁড়াইয়া অশোক তাড়াতাড়ি ভিতরে চলিয়া গেল, দরজা আটকাইয়া কেহ বসিয়া নাই, তা না হইলে হয়তো পথ নাই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিত। কিন্তু আলো? সবগুলি আলোই কি আত্মহত্যা করিয়াছে? নাঃ, এমন সব মানুষের সাথে ঘর করা মুস্কিল। বিছানাও পাতা হইয়াছে কি না কে জানে! অথচ রাত একটা তো বাজে। অশোক ফিরিয়া আসিয়া দরজার কাছে একটু দাঁড়াইয়া জোরে বলিল, "আমার তো আর সারা রাত জাগবার সখও নেই, সময়ও নেই, শোবার ব্যবস্থা কিছু হয়েচে কি না বলো? ও মা, বিছানা কি পাতা আছে?"

একটা মিনিটও নিশ্চিন্তে বসিয়া থাকিবার যো নাই। নিরুপমা এতক্ষণে তাকাইল।

অশোক ততক্ষণ আবার ভিতরে চলিয়া গিয়াছে। পায়ের ধাক্কায় কি যেন একটা পড়িয়া গেল। অন্ধকারে ঠিক ঠাহর করিয়া চলা যায়? কিন্তু নিজের ঘরে আসিয়া দেখিল, মিট্‌মিট্‌ করিয়া একটা আলো এঘরে জ্বলিতেছে। ইস, কী বিকট গান! সারা রাত কি আর ঘুম হইবে? বাতিটা উস্কাইয়া অশোক বিছানায় গিয়া শুইয়া পড়িল। সমস্ত বিছানা জুড়িয়া শুইয়া গভীর ঘুমের আশা করিতে লাগিল। কিন্তু যে বিকট গান! ও, আলোটা আবার

নেবানো হইল না ; কী জালা ! কিন্তু না-নিবানোই থাকুকনা, জ্বলুক না জ্বল্ জ্বল্ করিয়া, তার কী ?

গানের এখন নিশ্চয় অর্ধেকও হয় নাই, কখন শেষ হইবে কে জানে। না আছে একটা পরচুলা, না আছে একটা পোষাক—এই দেখিতে আবার সারারাত জাগা ! সেই বেলা দশটা অবধি, ওরে বাপ্ রে ! চোখে এত ঘুম থাকিতে একটু ঘুমানোর উপায়ও নাই। সামনের জানালাটা অশোক ঠাস্ করিয়া বন্ধ করিয়া দিল। কাল ভোরেই তো আবার দৌড়ুতে হবে ইষ্টিশনে, অথচ এখনও······ ······নাঃ অসম্ভব !

—কেমন সুন্দর হচ্ছিলো, তা-ও একটু দেখবার যো নেই। ওমাগো, আলোটা কী রকম জ্বলছে ! আগুন লাগাবে নাকি ? জেগে থেকেও এটা চোখে পড়ছে না ?—বাতিটা কমাইয়া দিয়া শীলাবতী বলিল, "নিজের ঘুম পেয়েছে, সোজা শুয়ে পড়লেই হয়, সঙ্গে সঙ্গে অন্য কারুরও ভয়ানক ঘুম পাবে এমন কোন কথা আছে ? কী ভালো লাগছিলো, তবু দেখতে পারলাম না !"

—মেয়েদের তো ওই দোষ, ভালো রুচি কাকে বলে তা জানে না। অশোক বলিল।

—থাক্, থাক্ বক্তৃতার আর দরকার নেই।

শীলাবতী কি হাসি চাপিতেছে ?

—আমি বুঝি সেইদিক থেকেই বলেছি ? আমি বলেছি এক মহত্তর—

—থাক্, থাক্, আর বলতে হবে না। শীলাবতী বিছানার কাছে আসিল। আস্তে আস্তে পাশ ফিরিয়া অশোক কিছু বলিতে গিয়া শীলাবতীকে দেখিতে পাইয়া চোখ বুজিল। বিড়্ বিড়্ করিয়া বলিতে লাগিল, "যাওনা, প্রাণ ভরে দ্যাখোগে, সারারাত জেগে দ্যাখো, আমি তো আর অমন বাজে সখে সারারাত জেগে তারপর ভোরবেলা ট্রেণে চ'ড়ে ঘুমে ঢুলেত পারিনে।"

হাসিয়া শীলাবতী বলে, "নাঃ, এঘুম আর কিছুতেই ভাঙ্‌বে না দেখ্‌ছি।"

অশোক তাহার বুকে একটা মৃদু উষ্ণতা অনুভব করিল। 'চোখ মেলিলে কথা বলিতে হয়, বোধ করি সেই ভয়েই সে চোখ বুজিয়াই পড়িয়া রহিল।

বাইরে ভাসান-গান। মেয়ে সাজিলেও সর্দারের গলাটাই সব চেয়ে বেশী জোর শোনা যায়।

প্রত্যাবর্তন

দীর্ঘ পঁচিশটা বছর পরে।

বিকালের রোদের নীচে সরু আলের পথ দিয়া হাঁটিতে-হাঁটিতে প্রশান্ত ভাবিল, দীর্ঘ পঁচিশটা বছর পরে আবার এই প্রথম সে গ্রামের দিকে পথ চলিতেছে। সেই পরিচিত পথ। সেই বুনোফুল-ঘাস-লতাপাতার গন্ধ, শুকনো পাতার স্তূপে কোন্ অদৃশ্য প্রাণীর খস্ খস্ শব্দ, হঠাৎ কখনো সারি সারি আকাশ-ছোঁয়া তালগাছের সামঞ্জস্যহীন অবস্থিতি, সেই খেয়াঘাটের নৌকা ও মাঝি। বছরের পর বছর, মুহূর্তের পর মুহূর্ত কতো পরিবর্তন চলিতেছে, কতো স্বেচ্ছাচারীর চোখে-মুখে উল্লাস, কতো ডাকাত পরের অন্নে মাথা ঠোকা-ঠুকি করে, অথচ এখানে তার ছোঁয়াচটুকুও নাই। পঁচিশ বছর আগের পুরুষরা একদিন আকাশের দিকে চাহিয়া নিরুপায়ে কাঁদিয়াছে, তার বংশধররা আজো কাঁদিতেছে, তাহাদের চোখ-মুখ ফুলিয়া গেল। আকাশে কি একটা পাখি চমৎকার ডাকিয়া গেল। কিন্তু সেদিকে চাহিতে প্রশান্তর ভয় হয়! যে আকাশের দিকে চাহিয়া উহারা কপালে হাত ঠুকিয়াছে, সেই আকাশের দিকে প্রশান্ত তাকাইতে পারে না।

পথের একপাশে পাট ক্ষেতের ভিতর বসিয়া কয়েকটা লোক নিঃশব্দে ক্ষেত নিড়াইতেছে। হঠাৎ কখনো কোনো শহুরে চেহারার লোক দেখিলে পঁচিশ বছর বা তারও আগে তাহারা যেভাবে তাকাইত, আজও সেইভাবে তাকায়।

চোখ ছোটো করিয়া চাহিয়া একজন বলিল, বাড়ী?

বাড়ী! প্রশান্ত মনে-মনে একবার হাসিল। বাড়ী তাহার কোথায়! ভারতবর্ষের কোন্ গ্রামে বা শহরে? বাড়ী?

পৌঁছিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া গেল।

প্রশান্ত দেখিল, একটা ঘর প্রায় ধ্বসিয়াই গিয়াছে, আরেকটা ঘরের চাল নাই, কেবল কয়েকটি খুঁটি—একটা বটগাছ ঘরের উপর দিয়া একেবারে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছে, উঠান-ভিটি সমস্ত জঙ্গলে ভরা।

এই বাড়ী! এই বাড়ীর ঠিকানাই প্রশান্ত সেই পথের পাশের লোকদের বলিয়াও বলে নাই। পঁচিশ বছরের দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসে সে বাঁচিয়া আছে বটে কিন্তু তাহার ছোটবেলার ক্রীড়াভূমি আত্মহত্যা করিয়াছে। কৈশোরে এই প্রাঙ্গন হইতেই সে তাড়িত, কি একটা কারণে সংসারে একটা ভীষণ অনর্থ সৃষ্টি করায় শান্তিপ্রিয় বাবার চক্ষুশূল হওয়া, আর আজ এতকাল পরে তাহাকে আমন্ত্রণ করিতেও একটি প্রাণীও নাই। প্রশান্ত ভাবিল, এখনো কেউ তাহার দিকে সন্দেহের চোখে চাহিতেছে না কেন? লোকগুলি কি রাতারাতি মানুষ হইয়াই গেল? সন্ধ্যার ঝাপ্‌সা আলোয় দুই-একজন যদিবা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাহার দিকে তাকাইয়াছে, প্রশান্ত তাহাদের কষ্ট করিয়াও চিনিতে পারে নাই। নিশ্চয় তাহারাও তাহাকে চেনে না।

কয়েকটা চামচিকা ঝটাপট্‌ মাথার উপর দিয়া উড়িয়া গেল। আশে-পাশে নানারকম কীটপতঙ্গের অবিশ্রান্ত চেঁচামেচি শোনা যায়, বন্য লতা পাতার একটা অদ্ভুত গন্ধও নাকে আসে।

বাঁ দিকের একটা রাস্তা হইতে, প্রশান্ত যে পথে চলিতেছিল, সেই পথে পড়িয়া কে একটা লোক নিজের মনে গান গাহিতে গাহিতে সামনের দিকে চলিতেছে। তাহার পরণে লুঙ্গি, কাঁধে একখানা গামছাই হইবে, হাতে একটা নিড়ানি।

প্রশান্ত একেবারে সামনেই গিয়া পড়িল, বলিল: কালু মিঞা না?

লোকটা থামিল, গানও থামিল, ভ্রূ কুঁচ্‌কাইয়া তাহার দিকে তাকাইল।

সে যে কালু মিঞা ছাড়া আর কেহই নয়, ইহাতে নিশ্চিত হইয়া প্রশান্ত একবার হাসিল।—চিনতে পারলে না ?

কালুর চোখের দৃষ্টি এবার সহজ হইয়া আসে, ঠোঁটের দুই পাশে আস্তে আস্তে হাসি ছড়াইয়া পড়িল, তাহার দিকে একবার হাত বাড়াইয়া আবার কি মনে করিয়া আস্তে গুটাইয়া তাড়াতাড়ি বলিল : বন্ধু না ?

হাত ধরিতে তাহার সঙ্কোচ দেখিয়া প্রশান্ত নিজেই হাত বাড়াইয়া দিল, হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ।

কালু আবার বলিল, বন্ধু-মশয় না ?

—হ্যাঁ, কালু।

বিস্ময়ে আর আনন্দে এবার তাহার হাত জড়াইয়া ধরিয়া কালু বলিল : এতকাল কই আছিলা গো, বন্ধু-মশয় ? সেই কোন কালে গেলা, আর এতদিন বাদে ফিরা আইলা, একটা-দুইটা দিন নাকি ! আহারে, এ যে বুড়াও বইনা গেছো দেখছি !

—আর তুমি খুব জোয়ান, না ?

—আমরা গেরামে থাকি, রৈদে-বিষ্টিতে ভিজে খাটি-পিটি, আমাগোর কথা ছাড়ান দাও—

প্রশান্ত চারদিকে একবার চাহিল। এ গাঁয়ের নবীন বা প্রাচীন আর কেউ হঠাৎ এই পথে আসিয়া পড়িলে তাহাকে দেখিয়াও দেখিবে না, অথবা চাহিলেও একটা বিশেষ করুণার দৃষ্টিতে তাকাইবে, ইহা সে চায় না। বিশেষত তাহারা যখন দেখিবে এক ঝাঁক কঙ্কালসার মানুষের মধ্যে একটি মেদ-বহুল মাংসল পুরুষ।

প্রশান্ত বলিল : তোমার বাড়ী চলো, কালু।

ঘরের চালখানা প্রায় মাটিতে নামিয়া আসিয়াছে। উঠানে একটা ছোটো নারকেল গাছ।

ঘুট্‌ঘুটে অন্ধকার। একেবারে কাছে না গেলে কিছুই চোখে পড়ে না।

উপুড় হইয়া প্রশান্ত ঢুকিল দাওয়ায়। তাহাকে বসিতে একখানা পিড়ী দিয়া কালু আলো আনিতে চলিয়া গেল। একটু পরেই কুপি হাতে ফিরিয়া আসিল।

অগ্নিশিখাকে মধ্যবর্তী করিয়া এখন সবই স্পষ্ট দেখা যাইবে। কালু প্রশান্তর দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিল। অন্ধকারে অনর্গল বকিয়াছে সত্য কিন্তু আলোতে এমন বোবা হইয়া গেছে!

প্রশান্ত বলিল: কালু, এ কী অবস্থা দেখছি?

কী?

এদিক-ওদিক চাহিয়া প্রশান্ত বলিতে দ্বিধা বোধ করিল। বলিতে পারিল না।

কিন্তু কালু কিছুই বুঝিতে পারে নাই, এমন নয়। দুই হাঁটু একত্র করিয়া তার উপর হাত রাখিয়া সে ধীরে ধীরে বলিল: বন্ধু, তোমার ঘর ভাঙ্গা গেছে, ধন আছে কি না জানি না, আমার জন আছে এই এক রকম, ধনের খোঁজও রাখিনা, সবই নসিব, এই নসিবের খেলা!—কপালে আঙল ঠুকিতে লাগিল কালু।

প্রশান্ত হাসিল।

—হাস' কেন?

প্রশান্ত আবার হাসিল, কিন্তু এবারও নিরুত্তর।

বা'রে, মুখ টিপা-টিপা খালি হাস' কেন? কালু অধীর হইয়া উঠিল।

হাসি থামাইয়া প্রশান্ত বলিল: কি বলছিলে? নসিব, সবই নসিবের খেলা, না?

—হ!

কালু, অমন কথা আর বলো না। দশজনের ভেতর নয়জন আমরা ভাল খেতে-পরতে পাচ্ছিনে—কেউ না কেউ শুধু একবেলা খাচ্ছি, কারুর কোনো

রকমে দিন যাচ্ছে, আমাদের সকলেরই নসিব তাহলে খারাপ, তুমি এই মনে করো ?

কালু স্তব্ধ হইয়া গেল, বাহিরের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে আবার হঠাৎ ডাকিয়া উঠিল : বাবা অলি, ও বাবা অলি ?

ডাকের সঙ্গে-সঙ্গেই বাইরের বিপুল অন্ধকার ঠেলিয়া একটি দশ-এগারো বছরের ছেলে আসিয়া হাজির হইল। খালি গা, পেট মোটা, হাত-পাগুলি সরু সরু, পরণে শুধু একখানা গামছা ; প্রশান্ত লক্ষ্য করিল, তাহার হাঁটায় কেমন একটা জড়তা ; একদিকে নিবদ্ধ চোখের দৃষ্টি।

তাহার চোখে বিস্ময়ের চিহ্ন দেখিয়া কালু তাড়াতাড়ি বলিল : পোলা আমার অন্ধ জনম হইতেই—তারপর ছেলের দিকে চাহিয়া—কিছু তামুক আইনা দে তো বাবা ?

ছেলে চলিয়া গেল।

প্রশান্ত বলিল : আর ছেলে নেই ?

উত্তরে কালু জানাইল, আর দুই ছেলে ভিন্ন গ্রামের দুই বাবুদের বাড়ীতে কাজ করে. বড়ো-ছোটো দুই জনে যথাক্রমে তিন টাকা আর আড়াই টাকা মাসে পায়।

কোনো রকমে উত্তরটা দিয়া কালু মনে-মনে ভাবিল, নসিব কিছুই নয় ?

কিন্তু প্রশান্তর খাওয়ার ব্যবস্থা তো করিতে হইবে। ব্যবস্থা সহজেই হইল। মুড়ি-চিড়া-গুড়, দুইটি পাকা আম।

কিন্তু আশ্চর্য, খাওয়ার জল দেয় নাই।

প্রশান্ত একরকম চেঁচাইয়া উঠিল, বারে, জল কোথায় !

কালু এতটা ভাবিতে পারে নাই। তাহার কথা শুনিয়া এমনভাবে তাকাইল যেন—অর্থাৎ কুয়া সামনেই আছে, নিজ হাতে তুলিয়া খাও !

দারুণ প্রতিবাদ করিয়া প্রশান্ত বলিল : না না, ওসব না, তুমিই এনে দাও, আমার জাত মারা যাবে না, আমাদের কোনো জাত নেই।

কালু অবাক হইল। লোকটা চিরকালই এমনি, কৈশোরেও এমনি অল্প-বিস্তর পাগলামি করিয়াছে, আজও সেই স্বভাব বদলায় নাই।

কিন্তু বিস্ময়ের ভাব অল্পক্ষণেই কাটিল। আবার মনে মনে সে ভাবিল, নসিব কিছুই নয়?

লোকটার কথা-মতো খড় দিয়া বিছানা পাতিয়া দেওয়া ছাড়া আর উপায় কী! কালু তার উপর বহুদিনের সঞ্চিত একটা নতুন কাঁথাও আনিয়া পাতিয়া দিল। বিচিত্র খড়ের বিছানায় পরম পরিতৃপ্তিতে শুইয়া প্রশান্ত ভাবিল, দীর্ঘ পঁচিশ বছরের অভিজ্ঞতায় মাটির শয্যাও তাহার কাছে মনোরম, সুখের সময়ের পরম অখাদ্যও শ্রেষ্ঠ খাদ্য—এ খবর কালু রাখে কি!

খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া একটু রাত করিয়াই কালু আবার আসিল। দাওয়ায় অনেকক্ষণ বসিয়া তামাক টানিল। ভিতরে তখনও জাগিয়া ছিল প্রশান্ত, শুইয়া শুইয়া তামাক খাওয়ার শব্দ শুনিতেছিল।

শেষে ভিতরে আসিয়া কালু আস্তে ডাকিল, বন্ধু?

—বলো।

অন্ধকারে বিছানার পাশে বসিয়া কালু কি যেন একটু ভাবিল, তারপর বলিল: তুমি আজকালও স্বদেশী কর?

প্রশান্ত মনে-মনে হাসিল।—সেদিন বড় ভুল করিয়াছিলাম বন্ধু, একলা পথ চলিয়াছিলাম, তোমাদের কথা কখনো ভাবি নাই, আজ আর সেই ভুল হইবে না। স্বদেশী! স্বদেশী করা কাকে বলে তা কালুই জানে।

প্রশান্ত কিছু না বলিয়া তাহার হাতটি শুধু ধরিল।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। চারিদিক নিস্তব্ধ। মাঝে-মাঝে কেবল নারকেল গাছে শব্দ, হাওয়া দোলায়। এছাড়া টু শব্দও শোনা যায় না।

প্রশান্ত বলিল: তুমি তখন বলেছিলে, আমার ঘর নাকি ভেঙ্গেছে—কালু, বাবা-মা'র মৃত্যুর খবর আমি জানি, না জানলেও পঁচিশ বছর পরে

ফিরে এসে তাদের দেখা পাওয়ার আশা করা উচিৎ নয়, কিন্তু আর মানুষ কোথায়? আমার পিসীমা, তাঁর ছেলেমেয়েরা, ঠাকুরমা?

তাঁরা? পিসীমারা তো তোমার বাবা যেই মইরা গেল তার কয়দিন পরেই চম্পট্, এই শূন্যপুরীতে কে আর পইড়া থাকতে চায় কও? কিন্তু পইড়া রইলো তোমার ঠাকুরমা, শূন্যি ঘর আগলাইতে একা পইড়া রইলো! বুড়ীর শকুণের পরমায়ু, তা না হইলে আর—এখানে আসিয়া কালুর গলার স্বর হঠাৎ থামিয়া গেল, যেন অন্ধকারে আস্তে আস্তে মিশিয়া গেল।

—তা না হলে কি? বলো?

কালু আর কিছুতেই বলিতে চায় না, কোন ভুলে একবার আরম্ভ করিয়া হঠাৎ তাহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে, প্রশান্ত অনেক পীড়াপিড়ি করিয়া তবে যা জানিতে পারিল তা সংক্ষেপে এই: বুড়ীর শকুণের পরমায়ু, একথা কালু আগেই জানিয়াছে। তা না হইলে আর শূন্য গৃহ পাহারা দিতে অতগুলি বছর বাঁচিয়া থাকে! আহা, মৃত্যুর সময় বুড়ী যা কষ্ট পাইয়াছে তা নাকি মর্মান্তিক। শেষের দিক দিয়া তো কেউ তাহার বাড়ীর ত্রিসীমানায়ও যাইতে পারে নাই, কেউ ভুলেও তাহার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলে সে যা-তা করিয়া গাল দিত, আর অভিশাপের তো অন্তই নাই। হয় তো মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল। তাই কালুও শেষ পর্যন্ত খোঁজ নেওয়ার চেষ্টা করিয়াও আর পারে নাই। শেষে হঠাৎ একদিন শুনিল, বুড়ী মরিয়া গিয়াছে এবং বড়ো কষ্টেই নাকি মরিয়াছে। রান্নার কিছু কিছু নামাইতে গিয়া হয়তো পা-দুটি একেবারে পুড়িয়া গিয়াছিল। তাহাই পাকিয়া-ফুলিয়া একদিন জ্বর হইয়াছে এবং তারপরেই—

প্রশান্তর চোখে জল আসিল। মৃত্যুর কথা তো নয়, মানুষ মরিলেও অনেক সময় শান্তি পায় এবং অন্যকে দেয়, কিন্তু পৃথিবীর বুক হইতে শেষ নিঃশ্বাস গ্রহণ করিতে মৃত্যুকে নিয়া জীবনের এমন বিশ্রী কাড়াকাড়ি, যার

শেষ দৃশ্য আরও নিষ্ঠুর আরও বিকট, সেই দৃশ্যের এমন তীব্র হীনতা যে চোখে জল আনিবে, এটা বিচিত্র নয়।

কিছুক্ষণ কালু হঠাৎ বাহিরে চলিয়া গেল, বলিল—বন্ধু, তুফান আইল!

—তুফান!

—হ! কী বাতাস ছাড়ছে গো! দেইখা যাও, দক্ষিণের আকাশটা কেমন লাল! লাল না যেন্ আগুণ!

—আগুণ?

—হ বন্ধু, আগুণ! কালু চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, সামাল তরী, সামাল মাঝি-ভাই, সামল তরী, সামাল্!

গাছে-গাছ শোঁ শোঁ আওয়াজ করিয়া ভীষণ হাওয়া বহিতেছে, আকাশে চিড়্-চিড়ে বিদ্যুৎ আর মেঘের ডাক, ঘরের খুঁটির সঙ্গে-সঙ্গে চালখানাও কাঁপিয়া উঠিল, পৃথিবীর কাতব প্রার্থনা যেন ঝড়ের পায়ে দারুণ লুটোপুটি খাইতেছে।

প্রশান্ত জড়ো-সরো হইয়া পড়িয়া রহিল।

ঘুম ভাঙ্গিল আবার কালুর ডাকেই। বোধ হয় সকাল হইতে আর বাকী নাই, মুরগীর ডাক শোনা যায়। কী আশ্চর্য, এখন আকাশ একেবারে পরিস্কার, প্রথম রাত্রির ঝড়ের কথা এখন স্বপ্ন বলিয়াই মনে হয়। দূরের আকাশে মধ্যরাত্রের চাঁদ উঠিয়াছে।

কালু বলিল, বন্ধু, মাছ ধরতে যাই।

—কেন?

—বারে, তোমারে খাওয়ামু না? তুমি আমার অতিথ্।

—এমন সময়?

—বারে, এই তো সময়! রাইতের তুফানের কথা ভুইলা গেছো বুঝি! কালু একটা গান ধরিয়া দ্রুত চলিয়া গেল।

প্রশান্ত বাহিরে আসিল। চারিদিকে ফুট্‌ফুটে জ্যোৎস্নায়। আর কেমন একটা ভিজা গন্ধ।

প্রশান্ত হাঁটিতে লাগিল। ঝির্‌-ঝিরে বাতাসে তাহার চোখ-মুখ ভিজিয়া আসিল। ভোর না হইতেই নানারকম পাখির কলরব সুরু হইয়াছে। দুই পাশে পাট ক্ষেতের সারি,, পাশে ঝুঁকিয়া সরু আলের পথটিকে প্রায় ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।

কিন্তু এ কী? প্রশান্ত দেখিল, সেপাইর মতো খাড়া শুধু কয়েকখানা খুঁটি, মাটির স্তূপ, গভীর জঙ্গল, বট গাছের গাম্ভীর্য, ভয়াবহ নির্জনতা, অথচ জ্যোৎস্নায় উজ্জ্বল।

প্রশান্তর দুই চোখ যেন বুজিয়া আসে। এই কঙ্কালের দিকে সন্ধ্যাবেলা তাকাইতে পারিয়াছিল, অথচ এখন আর তাকাইতে পারে না। বুড়ীর কাতর গোঙানি কি কেউ শোনে নাই? শেয়াল-কুকুর আজও ঘুড়িয়া বেড়ায়?

পুবদিকের আকাশ কি স্বচ্ছ হইয়া আসিতেছে?

অকল্পিত

একটি মাত্র হলে এত পরিচ্ছদ, এত শাড়ীর বৈচিত্র্য, তবু গুঞ্জন কোলাহল হইয়া ওঠে নাই, আর হয়ও না। কারণ, যে সমাবেশ, যে পরিবেশ—এখানকার বাতাসে সুরুচির সৌরভ, জীবনের বিশেষ অভিব্যক্তি।

মিসেস ঘোষ সমুদ্রপারের মেয়ে, আরও অনেক ইংরেজ মেয়ের মতোই একটি বাঙ্গালী ছেলেকে বিবাহ করিয়া আজ বছর দশেক হয় কলিকাতায়, অর্থাৎ ভারতবর্ষের আকাশের নীচে। বিদেশী এ বিহঙ্গীর বয়স হইয়াছে কিন্তু চেহারার জৌলুষ এতটুকু কমে নাই। বিশেষ করিয়া হাসিটি—বরফের কুচির মতো দাঁতগুলি কী সুন্দর চক্ চক্ করিয়া ওঠে! যাই বলো, ঘোষ লোকটি ভাগ্যবান, পত্নী-ভাগ্যে ভাগ্যবান। সেই মিসেস ঘোষ আজ এখানে আগত কয়েকটি স্বজাতির সঙ্গে একেবারে মিশিয়া গিয়াছেন। হয়তো ওই প্যাটার্সন লোকটির গা ঘেঁষিয়া, তাহার মুখের দিকে চাহিয়া লণ্ডনের রাজপথে অনেক তুষার-ভেজা সকালের কথা, বা গ্রীষ্মকালের সমুদ্রস্নান, তীরবর্তী বালুর আঘ্রাণ, অথবা কলেজ বিল্ডিংএর করিডরে একদিনের চপলতায় নিঃশঙ্ক আচরণ ও বিচরণের কথা মনে হইতেছে।

বাহিরে মোটরের ভীড় বাড়িয়া চলিয়াছে। শিল্পী জীবানন্দ সেন একা মানুষ, কারের হুশ্ আর জুতার মচ্ মচ্ আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত এবং ব্যস্ত হইয়া আসেন অভ্যর্থনা করিতে। নিঃসঙ্গহেতু এই ভয়, তাঁহারই চারদিকে দৃষ্টি না দেওয়ার ফলে কোন্ সম্ভ্রান্ত অতিথি অভ্যর্থনার উষ্ণতা হইতে বাদ পড়িয়া যান।

এটর্নী অতুল চৌধুরী একটি বধূর ছবি দেখিয়া আশ্চর্য্য হন, পাশে জীবানন্দের দিকে চাহিয়া বলিলেন, বাঃ, চমৎকার! জীবানন্দবাবু, শুধু এই ছবিখানা দিয়েই আপনাকে পৃথিবীর একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীরূপে অভিহিত করা

যায়, সত্যি, চমৎকার! জীবানন্দ মুচ্‌কিয়া হাসেন। এটর্নী সাহেবের সময় নাই, তাড়াতাড়ি সারিতে হইবে, চারদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া পাশে অগ্রসর হন।

আর একটি মেয়ে—যে মেয়েটির আঘ্রাণ পাইয়া নেহাৎ আত্মাভিমানী কোনো মেয়েরও চোখে তাক লাগিবে, তির্য্যক দৃষ্টিতে একবার অন্ততঃ সেদিকে চাহিবে—সেই মেয়েটি, অনেকেই জানে, ব্যারিষ্টার প্রতুল চক্রবর্ত্তীর কন্যা। অপরূপ রূপবতী (নেহাৎ আত্মাভিমানী কোনো মেয়েও একথা বলিবে)। গায়ের রং এত ফর্সা যে ঠোঁটের নকল রং-ও সৌন্দর্য্যে তীব্র হইয়া উঠিয়াছে। মাথার চুল কপালের পাশে ঈষৎ কোকড়ানো, কালো কুচ্‌কুচ্‌। মসৃণ, নগ্ন দুই হাতে চুড়ির ভার অল্প, পরণের শাড়ীতে আগুণ জ্বলে, লাল।

প্রোফেসর সুব্রত রায়ের বয়েস অল্প, ছেলেরা তাহার সঙ্গে ইয়ার্কি দেয়, তাহার সম্বন্ধে অনেক কিছু জানে, এমন কি তাহার ব্যক্তিগত জীবনেও দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াছে। অবশ্য সুব্রতর সেখানে অসম্মতি ছিল না, সে বলে: কেবল পড়ার সময় পড়া, অন্য সময় আমরা বন্ধুর মতো ব্যবহার যেন করি। কিন্তু ভাগ্যিস এখানে কোনো ছেলেই আসে নাই। তাহার পরণে ছাই রঙের স্যুট, চুলগুলি ব্যাক-ব্রাশ করা, কতকটা লাল্‌চে রঙ্‌ ধরিয়াছে।

তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া বলিল, মিস চক্রবর্ত্তী? পাশে চাহিয়া শকুন্তলা হাসিয়া দিল—আপনি? তাহার মুখের দিকে চাহিয়া সুব্রত বলিল, ওই দিকটাতে একটা ছবি ছিল, সেটাকে আমার মতে শ্রেষ্ঠ বলা চলে—দেখেছেন?

ত্রস্তভাবে কথা বলা শকুন্তলার অভ্যাস। বলিল, আমিতো সব ছবিই দেখেছি, কোনটা বলুন তো?

—সে একখানা পোরট্রেট। শকুন্তলার গা ঘেঁষিয়া সেই ছবিটার দিকে যাইতে যাইতে সুব্রত বলিল। প্রথমে চারদিকে একবার যথাসম্ভব সুন্দর

ভঙ্গিতে তাকাইয়া তারপর শকুন্তলা ছবির দিকে দৃষ্টি দিল, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে কতোক্ষণ দেখিয়া বলিয়া উঠিল, শ্রেষ্ঠ একে বলা চলে না, রয়, আপনার বিচারকে তারিফ করতে পারিনে।

সুব্রত হাসিয়া বলিল, তাই নাকি? তাহার চোখে চোখে চাহিয়া শকুন্তলা বলিল, ছবিটার দিকে একবার চেয়ে দেখুন। যে অঙ্কন-পদ্ধতিতে জীবানন্দ এই ছবিটা এঁকেছেন, সেই ধরণের অনেকগুলো ছবি তাঁর আছে, এই দেখুন না, এটাও। এগুলোই নাকি তাঁর আজকালকার আঁকা—আমার কিন্তু ভালো লাগে না। তবে এখানাকে কিছু সইতে পারি, বেশ ভালোই এটা কিন্তু ভাবলে শ্রেষ্ঠ নয়।

—সেই হিসেবে দেখতে গেলে অবিশ্যি আপনার কথাই ঠিক, হ্যাঁ, আপনি যা বলেছেন……। টানিয়া টানিয়া বলিতে লাগিল সুব্রত, কোন্ হিসাবে দেখিতে গেলে যে তাহার কথাটা ঠিক, সেটা সে নিজেও জানে না। তাড়াতাড়ি আর একপাশে গিয়া আঙুল বাড়াইয়া শকুন্তলা বলিল, দেখুন তো এটা, কী wonderful execution!

অতিরিক্ত হাসিয়া সুব্রত বলিল, wonderful!

'মিস চক্রবর্ত্তী'?

পেছন ফিরিয়া শকুন্তলা আশ্চর্য্য হইল, হাত বাড়াইয়া বলিল, Good Heavens! কখন এলেন?

মৃদু হাসিয়া পল বলিল, এইতো এখন। আপনি?

—আমিও বেশীক্ষণ হয়নি এসেছি।

—সব ছবি দেখা হলো?

—হ্যাঁ। শকুন্তলা তাহার হাত ধরিয়া বলিল, চলুন, আপনাকে দেখাচ্ছি।

ভয়ানকভাবে সুব্রত ছবি দেখায় মন দিল। কিন্তু মঝে মাঝেই চোখদুটি ছবি হইতে সরিয়া সেই ছোক্‌রা সাহেবটি, আর শকুন্তলার উপরে গিয়া পড়ে।

পল বড়ো সোজসুজি—দেরি সহিতে পারে না, সম্মুখের ছবির বিষয়ে শকুন্তলার বক্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়াই বলিয়া ফেলিল : মিস বচক্রবর্ত্তী, আপনাকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে!

হাসিয়া শকুন্তলা বলিল, Thank you.

হলের মাঝখানে দাঁড়াইয়া একদল গল্প করিতেছে। অবসরপ্রাপ্ত ম্যাজিস্ট্রেট অবণী সিংহ এক বন্ধুর ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের পরিচয় করাইয়া দিতেছিলেন। ছেলেটির গায়ে এখনও বিলাতের গন্ধ তীব্র। সিংহ-কন্যা সেই গন্ধই শুঁকিতে লাগিল। সে নিজেও যে কয়েক বছর আগে তাহার বাবার সঙ্গে বিলাত গিয়াছিল, সেকথাও জানাইতে ভুলিল না। অবণী সিংহ নিজে আরেক পাশে সরিয়া মিশনারী উইলিয়ামসনের সঙ্গে আলাপ আরম্ভ করিলেন।

বাইরে এখনও একটু আলো আছে বটে, ভিতরে অন্ধকার। তাই সবগুলি আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। সেই আলোতে মেয়েদের শাড়ী ঝল্‌মল্, মুখে স্নিগ্ধতা। মসৃণ-মেঝেতে জুতার মৃদু আওয়াজ, কথার গুঞ্জনে কতকটা চাপা পড়িয়াছে।

জীবানন্দ জানিতেন, ইহাদের বেশীর ভাগই ছবি কিনিবেন না, ইঁহাদের অনেকেই ঠিক সমঝদার নন, এবং—জীবানন্দ আরও কিছু হয়তো জানিতেন কিন্তু তবুও আশা। যাই বলো, এমন সমাবেশ আর কোনোবারও হয় নাই। না, না, তাঁহাদের সম্বন্ধে অভিযোগ করা মিথ্যা। আবার কে আসিলেন?

সকলে বাইরের দিকে তাকাইল। জীবানন্দ অগ্রসর হইলেন। বাইরে হাসি, কথা আর জুতার শব্দ। ক্রমেই স্পষ্ট হইতেছে।

তাহারা কয়েকটি ছেলে ও মেয়ে—বাইশ তেইশ হইতে তিরিশ বছর পর্য্যন্ত বিভিন্ন বয়সের। ছেলেদের মধ্যে পরণে কারুর সুট, কারুর সাদা ধুতি আর পাঞ্জাবী। তাহাদের আসার সঙ্গে সঙ্গে সারা হলটি কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। একেকজন উজ্জ্বল হাসিয়া, জোরে কথা

বলিয়া, স্বাস্থ্যের প্রসন্নতায় এখান হইতে সেখানে ঘুরিয়া ছবির পর ছবি দেখিয়া চলিল।

সকলে বিরক্ত হইল। মিসেস গুপ্ত আজকালকার ছেলে-মেয়েদের—বিশেষতঃ ওই নবাগত দলটির মধ্যে ফর্ম্যালিটির নিতান্ত অভাব দেখিয়া নাক সিঁটকাইলেন। কী বিশ্রী! সাধারণ এটিকেটও কি ইহাদের জানা নাই? এটর্ণী অতুল সরকার নিজের মেয়ের দিক হইতে এমন কোনো দোষ নাই ভাবিয়া মনে মনে আশ্বস্ত হইলেন। আর কী চেঁচামিচি! তাহাদের দিকে মাঝে মাঝে আড়-চোখে চাহিয়া শকুন্তলা কথা বলিতে লাগিল। পেছনের চুলে হাত দিয়া অবণী সিংহের মেয়ে ভাবিল: আহা, মেয়েগুলির চেহারার যা ছিরি! তেমনি কাপড় আর জামা। যেন এইমাত্র কোথা হইতে যুদ্ধ করিয়া আসিল। বুকের উপর আঁচল টানিবার সাধারণ ষ্টাইলটুকুও কি উহাদের জানা নাই? ওরকম পাড়ের আর রঙের কাপড় আর আজকাল চলে না, যাই বলো।

জীবানন্দও দারুণ বিরক্ত হইয়া এদিকে আসিয়া যোগ দিলেন।

বেগ্‌নী রঙের শাড়ী পরিহিতা একজোড়া তীক্ষ্ণ ভ্রূবিশিষ্ট শ্যামবর্ণা একটি মেয়ে প্রায় চিৎকার করিয়া উঠিয়াছে: আয়ার? আয়ার?

একপাশে দাঁড়াইয়া আরও কয়েকটির সঙ্গে মিলিয়া আয়ার একটা ছবি দেখিতেছিল, ডাক শুনিয়া ইংরিজিতে বলিল, কেন?

হাত দিয়া কাছে আসিতে ইঙ্গিত করিল মেয়েটি। কিন্তু উত্তর দিয়া আর আয়ার সেদিকে তাকায় নাই, নিজ মনে ছবি দেখিতে লাগিল। কিছুক্ষণ পরে মেয়েটি তাহার কাছে আসিয়া বলিল, Am I to shout your name this whole evening comrade?

আয়ার হাসিয়া দিল, বলিল, এ-তো তোমাদেরই দেশ, কমরেড, তোমরা তো ঘরের লোক, আমরা তোমাদের অতিথি।

মেয়েটি বলিল, come, come, কিন্তু ওধারে তোমাকে একটি জিনিষ দেখাবার আছে, চলো।

ভাসা ভাসা, সুন্দর চক্ষুবিশিষ্ট আরেকটী মেয়ে কাছে আসিয়া বলিল, লাবণ্য কেমন লাগছে ?

লাবণ্য আর একদিকে যাইতে যাইতে বলিল, এখনও বলতে পারিনে।

—তার মানে ? কোনো উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই ফর্সা মেয়েটি হাসিয়া দিল।

নির্ম্মল আসিয়া বলিল, মিস সীতা, আপনার দেখা হয়েচে ?

—মোটেই না।

—কমরেড আয়ার এসব দেখে খুশী হচ্চে নিশ্চয়ই ?

—তাই মনে হলো।

—আর, দেশাই ?

—ওই তো—সীতা অঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিল।

দেখা গেল, দেশাই ভয়ানক নত হইয়া গভীরভাবে কী একখানা ছবি দেখিতেছে।

নির্মল তাহার উপরে গিয়া পরিল :—হ্যালো কমরেড্ দেশাই, You've found something, I see ?

মিসেস গুপ্ত যেন আর এখানে থাকিতে না পারিয়াই স্বামীকে নিয়া মোটরে উঠিলেন।

লাবণ্য আবার আরেক গোলমাল বাধাইয়াছে। জীবানন্দর কাছে গিয়া বলিল, আপনিই জীবানন্দবাবু ?

বিরক্তি চাপিয়া তিনি বলিলেন, হ্যাঁ।

—একটু এদিকে আসুন। পরিত্যক্ত একখানা ছবির কাছে গিয়া লাবণ্য বলিল, Loneliness বলে এই যে ছবিখানা, এতে ল্যাণ্ডস্কেপ নেই কেন ?

জীবানন্দর বলিতে ইচ্ছা হইল, ফুটপাথের ধারে ল্যাণ্ডস্কেপের অনেক ছবিই পাওয়া যায়, সেগুলি কিনিলেই তো হয়!

লাবণ্য বলিল, কিন্তু তার আগে বলে রাখি, আপনার ছবি সম্বন্ধে আমার কোনো জ্ঞান নেই, বুঝিনে! তবে আপনি আমাকে বুঝিয়ে বলুন, আপনার আরও আঁকা সম্বন্ধেও বুঝিয়ে বলুন। আমি জানি, তাতে আমার মনে হয়তো একটা নতুন রুচি জন্মাবে, যাতে আপনার ছবি আমার খুব ভালো লাগবে। বিশ্বেস হচ্চে না? নতুন একটা টেষ্ট জন্মানো বুঝি অসম্ভব? কক্ষনো নয়। তাহলে একটা ব্যাপার বলি শুনুন।

ছেলেবেলা থেকেই আমি পুঁইচচ্চরি—

—পুঁইচচ্চরি? এই আন্তর্জাতিক আবহাওয়ায় পুঁইচচ্চরির নাম শুনিয়া জীবানন্দ সভয়ে একবার চারদিকে চাহিলেন।

লাবণ্য বলিল, হ্যাঁ। ওটা আমি কক্ষনো দেখতে পারিনি, গন্ধ পর্য্যন্ত শুঁকতে পারিনি, অথচ সকলের মুখে তার কতো নাম শুনেচি; শুনেচি, খেতে নাকি চমৎকার—এসব দেখে আশ্চর্য হয়েচি, ভেবেছি, তাহলে আমার কী হলো? কিন্তু আপনিও আশ্চর্য হবেন, আজো আমি পুঁইচচ্চরি ভয়ানক ভালো-বাসি, ভালো জিনিষের প্রতি মানুষের রুচিও তেমনি ভাবে জন্মায়, যদি দুর্ভাগ্য-বশত তেমন জিনিষ তার কোনোদিন ভালো না লাগে। পুঁইচচ্চরির ইতিহাস অবশেষে লাবণ্য শেষ করিল—আপনার ছবিও আমার তেমনি ভালো লাগবে, আপনি বুঝিয়ে বলুন। এই ছবিতে ওই লোকটির নিঃসঙ্গতাকে ফুটিয়ে তুলতে ল্যাণ্ডস্কেপের দরকার ছিল বলে মনে হয় না? লাবণ্য আগ্রহভরা চোখে, কতকটা বিজ্ঞের মতো শিল্পীর দিকে চাহিল।

অসহ্য! সহিতে না পারিয়াও অতি কষ্টে জীবানন্দ মনের বিরক্তি চাপিলেন। বলিলেন, ল্যাণ্ডস্কেপ ছাড়াই কি ওতে একটা Loneliness ফুটে ওঠেনি?

—হ্যাঁ, তা ফুটে উঠেচে অবিশ্যি।

—তাহলে? যে জিনিষটির কথা আপনি বলছেন, সেটা আপনার—শুধু আপনার কেন, সকলের কল্পনায় জন্ম নিক্, আমার আঁকার বিষয় নয়, আমি ওই পর্যন্ত এঁকেই বোঝাতে পেরেছি, ওইখানেই শেষ করেছি, ওই ছবি উপলব্ধি করবার পক্ষে আমার আর কোনোও দায়িত্ব নেই।

আশ্চর্য হইয়া লাবণ্য একবার শিল্পীর দিকে, আর একবার ছবির দিকে চাহিল।

—যদি আপনার এসম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান থেকে থাকে তবে নিশ্চয় বুঝতে পারবেন, প্রেজেন্টেশুনের ওই টেক্‌নিকই আমার আবিষ্কারের কৃতিত্ব।

ব্যাপার দেখিয়া পুর্বাগতদের যে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?, তাহারা যেন কোণঠাসা হইয়া পড়িয়াছেন। বয়স্করা যথাসম্ভব স্বাভাবিক ও সহজ হইয়া ছবি দেখিতে লাগিলেন। বয়স যাদের অল্প শকুন্তলা ও অন্যান্য মেয়েরা আড়চোখে চাহিয়া সব দেখিয়া-দেখিয়া চড়্‌কির মতো ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।

পল চলিয়া গিয়াছে। সুব্রত হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল, সামনের ছবিটি তার চোখে অপূর্ব হইয়া উঠিল, নত হইয়া খুব ভালো করিয়া সেটা দেখিয়া সে আবার চারদিকে চাহিল। একটু পরে স্বাভাবিকভাবে কতকটা অগ্রসর হইয়া দেখিল, ইতিমধ্যে আর একজন কা'র অত্যন্ত গা ঘেঁষিয়া শকুন্তলা কথা বলিতেছে।

Aweful, aweful! সেক্স্‌পীরিয়ান নায়কের মতো আরো কাছে গিয়া বলা হইল না যে—অথবা কানের কাছে মুখ নিয়া বিনা আড়ম্বরে এবং স্বাভাবিক ভাবে— মিস্ চক্রবর্ত্তী, ছবি দেখা হলো?—ইহাও বলা হইল না! চুলোয় যাক! নিজের উপর অনেক অভিমান করিয়াই সুব্রত একথা বলিতে বাধ্য হইল এবং কাছেই একটি বয়স্কা, ছিপ্‌ছিপে অত্যন্ত লম্বা, ছুচ্‌লো মুখের

শাড়ীপরিহিতা শ্বেতাঙ্গিনীকে দেখিয়া তাহার কানে কানে না হোক, সামনেই একটু ঝুঁকিয়া সুব্রত বলিল, Have you finished, Madam ?

—No. Thank you.

অনেকক্ষণ পরে, যখন প্রায় আর সকলেই চলিয়া গিয়াছে, সেই দলটি কেবল তখন একটা মস্ত বড়ো ছবির সামনে জটলা করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল।

জীবানন্দ মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছেন, দুই একটি সস্তা ছবি ছাড়া আর কিছুই বিক্রী হইল না ! আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই। তার উপর ওই মেয়ে আর ছেলেগুলির যন্ত্রণা। তাঁহার সব রাগ যেন উহাদের উপরই গিয়া পড়িল।

বড়ো ছবিখানার নাম Mass.

সীতা বলিল, কী সুন্দর !

দেশাই অত্যন্ত খুশী হইয়া সায় দিল।

লাবণ্যর চোখেও বিস্ময় !

নির্ম্মল বলিল, দেখেছেন, কমরেড ঘোষ, ম্যাস্-এর কী চমৎকার রূপ ফুটে উঠেছে এই একখানা ছবিতে ! এরা পথ চলতে পারে না, এদের দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত নেই, এদের দৃষ্টি নিষ্প্রভ, অথচ এরাই জীবনের জীবন, মহাপ্রাণের মূল উৎস, মুষ্টিমেয় মানুষের অসম্ভব বিলাসের উপকরণ জোগায় এরাই ! কী আশ্চর্য্য দেখুন, একখানা ছবিতেই আমাদের কতো কথা মনে পড়ে গেল, আমরা অনুভব করলাম। (একথায় সবচেয়ে আশ্চর্য্য হইল লাবণ্য, কারণ এই কথাটি জীবানন্দ তাহার কাছেই প্রথম বলিয়াছেন) কমরেড সীতা, এই একটি ছবি দেখেই আপনার নিশ্চয় মনে হয়, আমাদের চারদিকে চাপা কান্নার শব্দ, আমাদের চারদিকে জীবনের হীনতম উদাহরণ, খাদ্যের অভাবে, শিক্ষার অভাবে কুৎসিত ব্যারামের ছড়াছড়ি, মানুষ হয়ে পশুর জীবন-যাপন। আমাদের চারদিকে অবরুদ্ধ নিঃশ্বাস, কোটী কোটী ভয়ার্ত চোখ, তারা যেন খুনের অপরাধে অপরাধী একপাল মানুষ। কমরেড দেশাই, এত কথা যাঁর

ছবি দেখে আমাদের মনে হয়, তাঁর উদ্দেশ্যে নমস্কার জানাই! —তাহার কণ্ঠস্বর এক অপূর্ব্ব স্নিগ্ধতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, চোখের দৃষ্টি উজ্জ্বল।

সকলেই স্তব্ধ। ছবিতে নিবদ্ধ দৃষ্টি।

একটু পরে একজন বলিল, Let us buy this picture.

লাবণ্য তৎক্ষণাৎ অত্যন্ত উৎসাহে বলিয়া উঠিল: আমি সায় দিচ্ছি। আরও সকলের সায় দেওয়ার উৎসাহে সারা হলটি আবার কোলাহলে ভরিয়া উঠিল। জীবানন্দ মুখ তুলিয়া চাহিলেন, রাগে দৃষ্টি তাঁহার তীব্র হইয়া উঠিল।

দেশাই বলিল, ছবিটার দাম কতো?

—তিনশো।

নির্ম্মল মুখে মুখে হিসাব করিল—আমরা পনেরো জন, প্রত্যেকে কুড়ি টাকা করে দিলেই হবে। রাজী?

—রাজী।

লাবণ্য দৌড়াইয়া গেল জীবানন্দর কাছে, তাঁহার হাত ধরিয়া আব্দারের ভঙ্গিতে বলিল, আমরা অত কষ্ট করে একা একা সব দেখে বেড়াচ্ছি, আর আপনি এখানে চুপ করে বসে আছেন। জানেন, আপনার অঙ্কন-পদ্ধতি আমি বুঝতে পেরেছি, তাই তো অত ভালো লাগলো। না, না, এখানে বসে থাকলে চলবে না, আপনি চলুন, আমাদের সঙ্গে যোগ দিন। জানেন, আপনার 'ম্যাস' ছবিখানা আমরা কিনবো? চলুন—লাবণ্যর দুই চোখে হাসি।

জীবানন্দ আশ্চর্য্য হইলেন, কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অভিভূতের মতো সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন, কাছে গেলে সকলে শ্রদ্ধা আর বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিল দুই হাত তুলিয়া নমস্কার করিল। লাবণ্য কিন্তু হাসি মুখে জীবানন্দর একটি ভারী হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়াই আছে, যেন তাঁহার অতি আপনার কোনো আত্মীয়া! তারপর যখন তাহারা সকলে শিশু-সুলভ হাস্য-কোলাহলে চারিদিক ভরিয়া চলিয়া গেল, জীবানন্দ তখনো বিস্ময়ে তাহাদের দীপ্ত গতিপথের দিকে চাহিয়া রহিলেন। কোন এক সময় সেই বিস্ময়ের ভাব কাটিলে জীবানন্দ ফিরিয়া সেই ছবিখানার দিকে তাকাইলেন, আজ এই মুহূর্তে নিজের সৃষ্টিরও অত বড়ো রহস্য তাঁহার কাছে দুর্বোধ্য হইয়া উঠিল যেন।

মহাপ্রয়াণ

ছয়টা বাজিয়া গেল তবু কেউ আসিতেছে না। অথচ সাড়ে ছয়টায় মিটিং। উদ্যোক্তারা অধীর হইয়া উঠিল, শেষে স্থির করিল, এমন কাণ্ড তাহারা জীবনেও দেখে নাই, শোকসভার অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যে এমন বেকুব বনিয়া যাইবে, ইহা তাহারা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই। একজন একটা অত্যন্ত কঠিন মন্তব্য করিয়া ফেলিল, আজ যাহারা শোকসভার "এই আড়ম্বরহীন অনুষ্ঠানে যোগ দিতে দ্বিধা করিতেছে, কাল যে তাহারাই আবার শ্রাদ্ধ বাসরে উপস্থিত হইতে কুকুরের মতো ঠেলাঠেলি করিয়া মরিবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহ নাই! সুবোধ ঘোর জাতীয়তাবাদী, এমন কি বাঙলাকেও ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করিয়া দেখে কিন্তু আধুনিক সব কাণ্ড-কারখানা দেখিয়া বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীষণ সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছিল, অত্যন্ত বিরক্তি-ভরা সুরে সে বলিল, বাঙালীর আবার টাইম!

মৃত মধুসূদন দাস মহাশয়ের মোটরের ড্রাইভারটি খাটিতে খাটিতে হয়রাণ হইয়া গেল। তবু ও সে তাহার ভবিষ্যৎ-ভাগ্যনিয়ন্তা চাকরিটাকে দাস-মহাশয়ের অন্যান্য ছেলেদের মতোই উত্তরাধিকারসূত্রে অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিবে কিনা কে জানে। সভামণ্ডপটাকে চমৎকার সাজানো হইয়াছে, আরামদায়ক চেয়ারে, ইলেকট্রিক লাইট ইত্যাদিতে চমৎকার। প্রেসিডেন্টের টেবিলের উপর রাশি-রাশি ফুল, ফুলের মালা, মাথার উপর ঝালর-দেওয়া দামী সামিয়ানা। সেই ঝালরগুলি বাতাসে মৃদু কাঁপিতেছে।

মধুসূদন এত টাকা রাখিয়া গিয়াছেন যে তাহা রূপকথার মতোই শোনায়। অথচ তাঁহার জীবনের কোথাও আড়ম্বরের চিহ্নমাত্র নাই। এক পয়সা দিয়া একটা সিগারেটও কিনিয়া খান নাই কখনো, নিজের স্ত্রী ছাড়া দ্বিতীয় স্ত্রী-

লোকের মুখ দেখেন নাই জীবনে। একটা মোটর কিনিয়াছিলেন, তা-ও লোকের কথায় নিতান্ত ঠেকিয়া কিন্তু সেই মোটরে একটি দিনের জন্যও কখনো চড়েন নাই। এমন সরল অনাড়ম্বর জীবন যাহার ছিল, প্রাচুর্য্যের ভিতর বাস করিয়াও যিনি অপ্রাচুর্য্যের রূপকে চিরকাল ভক্তিভরে প্রণাম করিয়াছেন, তাঁহার স্বর্গগত আত্মার সদগতি কামনার উদ্দেশ্যেই আজ সকলে এখানে সমবেত হইবে।

উদ্যোক্তারা ভুল করিয়াছিল, যতটা হীন মন্তব্য তাহারা মানুষের সম্বন্ধে করিয়াছিল, ততটা হীন হইবার যোগ্য তাহারা নয়। সাতটা বাজিবার আগেই সকলে একে-একে আসিয়া হাজির হইল। স্থানীয় ইম্পিরিয়েল ব্যাঙ্কের এজেণ্ট নিজে আসিলেন না কিন্তু তাঁহার কর্ম্মচারীদের পাঠাইয়া দিলেন। অন্যান্য ব্যাঙ্কের কর্ম্মচারীরাও আসিল। প্রেসিডেণ্ট যিনি নির্বাচিত হইয়াছিলেন তিনি মধুসূদনের মতো কোনো রূপকথারই নায়ক। সকলে তাঁহার জন্যই কাতর হইয়া অপেক্ষা করিতেছিল। সকলের শেষে যখন তাহার ভারী মোটরখানা সভামণ্ডপের কাছে আসিয়া থামিল, উদ্যোক্তাদের পক্ষ হইতে উকিল অনাদিবাবু দৌড়াইয়া গেলেন তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিতে, প্রেসিডেণ্টের হাতের লাঠিখানা তাড়াতাড়ি নিজের হাতে নিয়া বলিলেন, আসুন, আসুন!

প্রেসিডেণ্ট বুদ্ধিমান, অত্যন্ত সাবধানে একটু হাসিলেন এবং তাঁহার এই হাসির স্বপক্ষে মূর্খ জনতা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিত সন্দেহ নাই কিন্তু এতদূর মূর্খতা তাহারা এখনও অর্জ্জন করে নাই যে শোকসভার কথা জানিয়া-শুনিয়াও হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিবে।

প্রেসিডেণ্ট সভামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন। একটা চমৎকার সেণ্টের গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গেল। প্রেসিডেণ্ট বুড়া হইয়াছেন সত্য কিন্তু প্রসাধনের সখ এখনও যায় নাই এবং তাঁহার শাস্ত্রে টাকাকড়ির সদ্ব্যবহারের কথাটার উল্লেখ

যেখানে আছে সেখানকার কিছুটা যে একেবারেই পড়েন নাই, এমন নয়। তাহাকে দেখিয়া একটা অস্পষ্ট গুঞ্জনে সভাস্থল ছাইয়া গেল'। প্রেসিডেণ্ট এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের গলায় মাল্যদানের পর সভার কাজ আরম্ভ হইল। একটা ভীষণ স্তব্ধতায় সভা ভরিয়া গেল। এমন নিস্তব্ধতার মধ্যেও অস্পষ্ট-স্বরে প্রেসিডেণ্ট কী বলিলেন তাহা মোটেই বোঝা গেল না। একথা কে না জানে, এই দরিদ্র দেশে টাকা পয়সা সঞ্চয় করিবার প্রবল উৎসাহেই তিনি গা ভাসাইয়া দিয়াছিলেন, পড়াশুনা করিবার সময় পান নাই। তাঁহার বক্তৃতা-শেষে এক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকিয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলী নিবেদন করা হইল। ইহার পর ওরিয়েণ্টাল ব্যাঙ্কের ম্যানেজার জীবানন্দ চক্রবর্ত্তী স্বর্গীয় মধুসূদন দাস মহাশয় যে বিখ্যাত দানবীর ছিলেন, একথার উল্লেখ করিলেন। কংগ্রেসের অনেক নিরাপদ সভায় বক্তৃতা তিনি হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছেন তাহার বক্তৃতায় সকলেই চমৎকৃত হইল।

এমন সময় ব্যাস্ত হইয়া প্রবেশ করিলেন শ্রীপতি। এত করিয়াও যে তিনি সকালে আসিতে পারিলেন না, তার জন্য আফশোষের অন্ত নাই। বাইরের অফিসকে কোনরকমে কাটাইয়া আসিতে পারিলেও আবার যে ভিতরের একটা মস্ত বড় অফিসের সম্মুখীন হইতে হয়, এই নিদারুণ অভিজ্ঞতা তাহার মতো অন্যান্য অনেক অফিস-ওয়ালাদের তহবিলেও আছে। বাড়ী ঢুকিয়াই শ্রীপতি দেখিয়াছিলেন, এই রক্তবর্ণ শাড়ী পরিয়া দুই মেয়ে তাঁহার দিকে রক্তনেত্রে চাহিয়া আছে, আরও শাড়ী চাই।" যে-পয়সা সে দিবে বলিয়াছিল সেই কবে, সেই পয়সার জন্য আর একবার শাসাইয়া গেল তাঁহার ছেলে-মেয়েরা, আর এই গোলমালে গৃহকর্ত্রীর কণ্ঠের স্বর তো শোনাই যায় না, কিন্তু আজ সকল চাওয়ালাকে উপেক্ষা করিবার সুযোগ পাইয়াছেন শ্রীপতি। তিনি ছুটিয়া চলিয়া আসিয়াছেন। তবুও তো দেরি হইয়া গেল। এমনি সংসার যে এক মিনিট নিঃশ্বাস ফেলিবার সময় তো নাই-ই, দৈবাৎ এমন একটা সভাতেও যোগ দেওয়ার সময় তাঁহার নাই!

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পাশে শ্রীপতি তাড়াতাড়ি একখানা আসন গ্রহণ করিলেন। উকিল অনাদিবাবু এখনও অভ্যর্থনায় ব্যস্ত কিন্তু শ্রীপতির অভ্যর্থনায় তাহার ভুল হইয়া গেল, তিনি তাঁহাকে দেখিয়াও দেখিলেন না। শ্রীপতি গভীর মনোযোগে, অভিভূত হইয়া বক্তার বক্তৃতা শুনিতে লাগিলেন। বক্তৃতা করিতেছিলেন এক সুবিখ্যাত ব্যাঙ্কার এবং জমিদার। তিনি ব্যবসায়ে মারোয়ারীর সাফল্য আর বাঙালীর অসাফল্যের কথা বিশ্লেষণ করিয়া এক নতুন তথ্য পরিবেশন করিলেন। এছাড়া মধুসূদনের মৃত্যুতে তাহাদের মহল্লের তথা সমগ্র ভারতের জনসাধারণের যে সমূহ ক্ষতি হইয়াছে, তার উল্লেখ করিলেন। শ্রীপতি বসিয়া বসিয়া সেই সমূহ ক্ষতির কথাই কেবল ভাবিতে লাগিলেন। ভাবিতে ভাবিতে একসময় চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, তিনি দাঁড়াইয়া গেলেন, গভীর স্বরে বলিলেন, মাননীয় সভাপতি মহাশয় এবং সমবেত বন্ধুগণ, আজ যাঁর মৃত্যুতে আমাদের মনের সব বেদনা জানাতে আমরা সকলে এখানে সমবেত হয়েছি, তিনি তো দুদিন আগেও আমাদের মধ্যে ছিলেন। অথচ তিনি আজ নেই, আমাদের শোকসাগরে ফেলে চলে গেছেন, আমরা হাবুডুবু খাচ্ছি। এটা যে কতো বড়ো ব্যাথার, কতো কষ্টের, আমাদের পক্ষে কতো শোচনীয়, তা আশা করি আপনাদের বলতে হবে না। তিনি যে নেই, একথা ভাবতেও আজ আমাদের কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। ... ...

শ্রীপতির সত্যই কণ্ঠরোধ হইয়া আসিল, তিনি ঝর্ ঝর্ করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

মূর্খ জনতা বিস্তর মূর্খতা অর্জ্জন করিয়াছে সন্দেহ নাই ; এটা যে শোক-সভা, একথা আর কিছুতেই মনে রাখিতে পারিল না, দারুণ করতালি দিতে লাগিল।

প্রান্তর

রক্ষিতরা সম্পন্ন, অর্থে এবং পরিবার-সভ্যসংখ্যাতেও। রান্নাঘরে উনান রেহাই পায় না,—শিশুদের কলরবে দেয়াল রেহাই পায় না, প্রতিধ্বনি করিয়া ক্লান্তি আসে। যেন একটি ছোটো-খাটো কারখানা। এ বাড়ীর গুঞ্জণের সঙ্গে ভোরবেলা যে কোনো লোকের এমনি হঠাৎ পরিচয় হয় যে মনে হয়, রাত থাকিতেই যেন এখানকার দিন-মানীয় কোলাহলের তোড়জোড় চলিতেছে। কোন ছেলের ভোরে ইস্কুল, তাহার খাওয়ার ব্যবস্থা ; বা কোনো শিশু রাত্রি-শেষে কাঁদিয়া উঠিল, শেষ পর্যন্ত মনোরমা না উঠিলে আর উপায় নাই। তারপর আস্তে ভোর হয়, তাড়া খাইয়া চাকর-বাকর ওঠে, সঙ্গে বাড়ীর অন্যান্য ঘুম-কাতর ছেলে-মেয়েরাও ; বাড়ীর গৃহিণীকেই অতি সকালে উঠিতে দেখিয়া বধূরাও কষ্টে আয়নার কাছে আসিয়া দাঁড়ায়, অবিন্যস্ত চুল অথবা কপালের সিঁদুর ঠিক করিয়া লয়।

মনোরমার পাঁচ ছেলে, চার মেয়ে। সব ক'টি ছেলেমেয়েরই বিবাহ হইয়াছে। মেয়েরা বেশির ভাগই থাকে দূর-বিদেশে, কেবল ছোটো মেয়েটির একই শহরে বাস। ছেলের মধ্যে চারটিই উপযুক্ত, অর্থাৎ যথেষ্ট অর্থ বহন করিয়া আনে। তারপর ছোটো ছেলেটির সম্বন্ধে বলিতে এইরূপ : কোন্ অশুভ প্রভাতে বাড়ী ঘেরিয়া পুলিশ, তারপর কি হইয়াছিল মনোরমা জানেন না, জ্ঞান হইলে দেখেন, বাড়ী ঘিরিয়া পুলিশ নাই, ছোটো ছেলে অজয়ও নাই! ছেলেটা মাত্র এম-এ পাশ করিয়াছিল,—নিজের ইচ্ছায় একটি গরিবের মেয়েকে বিবাহ করিয়াছে। এখানেই মনোরমার দুঃখ। ছেলেকে দিয়া অনেক আশা তিনি করিয়াছিলেন, বিলাত যাওয়ার খরচ শুদ্ধ কতো ডানাকাটা পরীর বাপও ঘোরাঘুরি করিতেছিল তাঁহার কাছে। তার উপর জেলে যাওয়া! দৈনিক পত্রের বহু বিজ্ঞাপিত ব্যাপার শেষে তাঁহারই ঘাড়ে আসিয়া চাপিল!

তারপর একটি বছর কাটিয়া গিয়াছে। এখন সবই আগের মতো সহজ। কক্ষের অভ্যন্তরে শিশুদের দাপাদাপি, কোলাহল, বধূদের চাপা হাসি, চুড়ির শব্দ, চাকর-বাকরের চেঁচামিচি, মনোরমার ব্যস্ততা—স্বামীর মৃত্যুতিথির উৎসব দিনেও এক ফোঁটা চোঁখের জল ফেলিবার সময় নাই।

তখন সন্ধ্যা হইয়াছে কিছুক্ষণ নিচতলায় পেছনদিকের বারান্দায় গলায় আঁচল জড়াইয়া সতী একাকী ঘুরিতেছিল। একপাশে একটি ছোটো ঘরের দরজার কাছে দেয়াল ঘেঁষিয়া বৃদ্ধা লাবণ্যলতা বসিয়াছিলেন। বংশের মধ্যে সকলের উর্ধতন দৃষ্টান্ত তিনি, মনোরমার শাশুড়ী, কিন্তু সাংসারিক রীতি অনুযায়ী আপন নয় সৎ। মনোরমার মৃত স্বামী তাহার নিজের ছেলে নয়, আগের পক্ষের। কিন্তু শোনা যায়, সেই ছেলে অনেক বড় হইয়াও নাকি জানিতে পারে নাই, লাবণ্যলতা তাহার মা নয়। যা-হোক, সেই ছেলে অবশেষে মানুষ হইয়াছে, শহরে বাসা বাঁধিয়াছে, অজস্র টাকা উপার্জন করিয়াছে, আবার নিজের সন্তানদের মানুষ করিয়াছে, তারপর হঠাৎ একদিন মারা গিয়াছে। সেও খুব অল্পদিনের কথা নয়, তবু আজও সেই লাবণ্যলতা বাঁচিয়া আছেন। চোখে কম দেখিতে পান, নিজে রাঁধিয়া খান।

কপালের কুঁচ্কানো চামড়া আরও কুঁচ্কাইয়া লাবণ্যলতা বলিলেন, তুই কে?

উত্তর আসিল, আমি।

—আমি? আমি কে?

সতী কাছে গেল, ইচ্ছা করিয়াই কানের কাছে মুখ নিয়া বলিল, "অজয় নামে একটা ছেলে আছে না? আমি তারই বন্ধু, নাম হলো সতী।"

লাবণ্যলতা নিজের মুখ সরাইয়া নিলেন, ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, ওমা-মা, তোদের সব কাণ্ড! সোয়ামীর নাম মুখে আনা যেন হেলা-খেলা, দিনে-দিনে আরও কত দেখতে হবে! আবার বলা হচ্ছে, বন্ধু! আচ্ছা, বন্ধুই যদি,

তবে বন্ধুর বিহনে একবারও চোখের জল ফেলিসনে কেন শুনি? অমন তাজা সোয়ামীটাকেও ঘরে আটকে রাখতে পারলিনে কেন শুনি? তোদের ভালোবাসায় ছাই!

হাসিতে-হাসিতে সতী বলিল, আমাদের তো কিছুই নয়, কিন্তু সেকালে আপনাদের ভালোবাসার নমুনা দু-একটি বলবেন শুনি?

—না, না বাপু, অত বক্ বক্ করতে আমি পারিনে। একটু চুপ থাকিয়া আবার বলিলেন, হুঁ আবার নাম রাখা হইয়াছে সতী!

দীর্ঘ বারান্দার ওই পাশে ইলেকট্রিক আলো জ্বলিতেছে। উপরে ছেলে মেয়েদের পড়াশোনার শব্দ শোনা যায়; নীচে মনোরমা অথবা মেজ ছেলের ডাকাডাকি, ঝি-চাকরদের কলরব।

এদিকে কোনো সাড়া না পাইয়া লাবণ্যলতা মুখ ফিরাইয়া দেখিলেন, সতী নীরবে কাঁদিতেছে।—ওকি, কাঁদচিস? ওতে কাঁদবার কী হলো? আমি ঠাট্টা করেছি বৈ তো নয়! হতভাগী, কাঁদিসনে, তোর কান্না দেখে আমারও যে কান্না পায়। মুখটি কোলোর মধ্যে টানিয়া লাবণ্যলতা তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া দিতে লাগিলেন—, একি, কুচবরণ রাজকন্যের অমন মেঘবরণ চুল কোথায় গেল? এ যে খড়ের আঁটি! আর কদিন পরেই একদম নেড়ে হয়ে যাবি যে! আমাদের সময় কেমন ছিল জানিস? চুলের ভারে গড়াগড়ি যেতাম মাটীতে!

এবার সতী মুখ তুলিয়া চাহিল, কিছুক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া শেষে হাসিয়া ফেলিল। লাবণ্যলতা হাফ ছাড়িয়া বাঁচিলেন।

অনেকক্ষণ পরে ঝি দামিনী আসিল, ভাঙা বাসনের মতো বাজিয়া উঠিয়া বলিল, খাওয়া-দাওয়া আপনার হবে না গো, বৌঠান? সবাই তো খেয়ে উঠলো।

যাওয়ার সময় লাবণ্যলতা সতীকে বলিয়া দিলেন, এবার এলে আমার ওষুধ নিয়ে যাস স্বামীকে বশ করবি।

পরদিন দুপুরবেলা। বারোটা বাজিতে না বাজিতেই সমস্ত বাড়ীটা একেবারে নিস্তব্ধ। মনোরমার চার ছেলে গিয়াছে কর্ম্মস্থলে, বাড়ীর ছেলে মেয়েরা যার যার ইস্কুলে অথবা কলেজে; মনোরমার মেজ ছেলের এক শ্যালী লীলা, এখানে থাকিয়া কলেজে পড়ে।

সতী আস্তে লাবণ্যলতার পেছনে গিয়া দাঁড়াইল, ডাকিল, ঠাকুমা?

তিনি ফিরিয়া চাহিলেন, তাহাকে দেখিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। এইমাত্র স্নান করিয়া আসিয়াছে সতী। ভ্রূ জোড়া, চোখের পল্লব আর পক্ষ্মে এখনও যেন জল লাগিয়া রহিয়াছে। ভিজা চুলগুলি খোলা, মাথায় ঘোমটা নাই। সিঁথী আর কপালে সিঁদুর।

—আমি যদি পুরুষ হতুম, তাহলে তোকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করতাম না, বৌ!

সতী হাসিয়া উঠিল, হাসিতে হাসিতে লাবণ্যলতার গায়ে ঢলিয়া পড়িল; তিনি চেঁচাইয়া উঠিলেন, উঃ, মাগো! বৌ, তোর মতো আর একটিও দেখিনি। তোর মতো দস্যি নাকি আমি! ব্যথা পাইনে?

হটাৎ তাঁহার মুখে দুই হাত চাপিয়া সতী বলিল, চুপ; বৌ বৌ নয়, সতী।

লাবণ্যলতা দুই চোখ কপালে তুলিলেন—সেকি! তুই কি এ বাড়ীর বৌ নয়? তোর আমি দিদি শাশুড়ী নই?

—না, না আমি আপনার বোন, বুঝলেন?

লাবণ্যলতা হাসিয়া বলিলেন, বুড়ো বেঁচে থাকলে সে সর্বনাশটা আজ হতো বটে। বোন না হয়ে তার কাছাকাছি তো হতিস।

আজ একাদশী। লাবণ্যলতা খাওয়ার আয়োজন করিতেছিলেন। কিন্তু আয়োজনটা ভাতের দেখিয়া সতী আশ্চর্য হইয়া বলিল, ওকি, ভাত-তরকারি যে?

—সেকি, এ ছাড়া আরও খাওয়ার আছে বলিস?

সতী বোকার মতোই বলিয়া ফেলিল, আজ না একাদশী!—উপরে সে একাদশীর উপবাসক্লিষ্টা মনোরমার জন্য খাওয়ার বিপুল আয়োজন দেখিয়া আসিয়াছে।

লাবণ্যলতা ফিরিয়া চাহিলেন, তাহার দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া হঠাৎ হাসিয়া দিলেন, বলিলেন, না বাপু আর পারিনে, ওসব আর সয় না। আমি মনে মনে হিসেব করেছিলাম কাল, ওরা কেউ আমায় বলেনি—সে যাক, ভালোই হয়েছে, ওসব কি আর এখন সয়?

এবার সহজ হওয়ার চেষ্টায় সতী সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বলিল, দেখি কী রেঁধেছেন?

সব আড়াল করিয়া লাবণ্যলতা বলিলেন, না না দেখে কাজ নেই। নিজের চরকায় তেল দাওগে বাপু!

—তাড়িয়ে দিচ্ছেন?

হ্যাঁ। সই, তুই আমার কাছ থেকে যা, তোকে দেখে আমার হিংসে হয়।

সতী তবু বলিল, আহা দেখি না কোন্ রাজভোগ আপনি খাচ্ছেন?

রাজভোগই বটে!

চমকিয়া সতী ফিরিয়া চাহিল, দেখিল, তীব্র দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া মনোরমা বলিলেন, রাজভোগই বটে! কিন্তু তোমার না হয় খাওয়া দাওয়া সংসার ধর্ম্মের ওপর বিতৃষ্ণা, সেজন্যে তো আর কেউ না খেয়ে বসে থাকতে পারে না! রোজই একী ব্যাপার শুনি? আমরা এমন কি অপরাধ করেছি যে তোমার খেয়ালের বোঝা আমাদের বইতে হবে?

নিজের যা কিছু খাওয়ার আয়োজন, সেগুলি কোনোরকমে ঢাকিতে ঢাকিতে লাবণ্যলতা বলিলেন সে কি?

সতী বলিল, যাই। তারপর মনোরমার পেছনে-পেছনে চলিল।

খাওয়া-দাওয়ার পর বসিল মিটীং। চার বধূই বিনা উদ্দেশ্যে একত্রিত

হইয়াছে। প্রধান বক্তা মনোরমা। শ্রোতার দল যার যার সন্তানরক্ষা-কার্যে আর অধিক ব্যাপৃত না থাকিয়া বক্তার প্রতি কান খাড়া করিল।

—বুঝলে, সেজ্ বৌ? সেজ-বৌর প্রতি মনোরমার টান একটু বেশি; তার বাপ মস্ত বড়লোক, কণ্ট্রাক্টরী করিয়া পয়সা করিয়াছেন, মেয়ের খোঁজ বরাবর নিয়া থাকেন, ভারি অমায়িক লোক, তাঁহার তুলনায় তাহারা কী-ই বা। মনোরমা বলিলেন, বুঝলে সেজ-বৌ, বলে কি না কোন রাজভোগ খাওয়া হচ্ছে দেখি!

মেজ বৌর উপর ঢলিয়া পড়িয়া, ঘোমটা ফেলিয়া সুলেখা ভয়ানক হাসিয়া উঠিল, বলিল, তাই নাকি?

মনোরমা ভ্রূকুঁচকাইয়া বলিলেন ছাখো কী সব বিশ্রী কথা! তাও কি না আমার সামনে! এখানে যেন বুড়ী না খেয়েই থাকছে! আর উনি সেটা বরাবর লক্ষ্য করে আসছেন। ওর মতো হিতাকাঙ্খী জগতে আর দুটি মেলে? কী দুর্বুদ্ধি পেটে ছাখো! আমি বলি কি—

সকলেই অবাক। সুলেখাই কেবল অনর্থক অতিরিক্ত হাসিতেছে।

—আমি বলি কি, রাজভোগ কাকে বলে সে তো আর জানা নেই, জানবার ভাগ্যিও কোনোদিন হয়নি, এখানে এসে ধাঁধাঁ লেগেছে!

সুলেখা তেমনি হাসিতে লাগিল: অর্থাৎ এ সম্বন্ধে আমি কোনো মতামতই প্রকাশ করিতে চাই না, আমার হাসি হইতে যা হয় বুঝিয়া নাও। তাহার হাসি দেখিয়া চার বছরের শিশু মণ্টু ও ছোটো ছোটো দাঁত বার করিয়া হাসে।

সন্ধ্যার পর সতী আবার গিয়া হাজির হইল। লাবণ্যলতা তাঁহার খুপড়িতে তেলের প্রদীপটি জ্বালাইয়া এইমাত্র নিজের বিছানার উপর বসিয়াছেন। ইলেট্রিক আলোর ব্যবস্থা থাকিলেও ব্যবহার করেন না, বলেন, বুড়া চোখে অত আলো সয় না।

সতী বলিল, তখন খাওয়া হয়েছিল?

হঠাৎ একটা গলার স্বর শুনিয়া লাবণ্যলতা চমকিয়া উঠিলেন, ভালো করিয়া দেখিয়া বলিলেন, তুই সতী ?

ধপ করিয়া এক পাশে বসিয়া সতী বলিল, হ্যাঁ, আমি। ঠাকুর মা, আপনি চোখে কম দেখতে পান বুঝি ?

—পাবো না ? বয়েস কি আর কম হলো ?

—কতো বয়েস হয়েছে আপনার ?

বয়েস ? বয়েস আমার·····হ্যাঁ, কালা-গোরার যুদ্ধ কবে হয়েছিল জানিস্ ? হিসাব করিয়া সতী আশ্চর্য হইল,—এ তো আশি বছরের কাছাকাছি ? আপনি তা হলে আজকের নন, ঠাকুর মা ?

লাবণ্যলতা হাসিলেন, কিছু পরে বলিলেন, আর একবার এমনি চক্ষু খারাপ হয়েছিলো, সেবার ভয়ানক হয়েছিলো, রাত্তিরে তো একেবারেই দেখতে পেতাম না, দিনে তবু কিছু পেতাম—কিন্তু সেই দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার স্থবির চোখের দৃষ্টি এক স্বপ্নের ছায়ায় ঘোর হইয়া আসিল।

সতী তা লক্ষ্য করে নাই, কিছুক্ষণ চুপ থাকিয়া বলিল, তখন খাওয়া হয়েছিল ?

তেলের প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলে, বিকীর্ণ আলোতে ছায়ার ভাগই বেশি, দুজনের মুখেই আলোর চেয়ে ছায়ার প্রলেপ বেশি।

—খেয়েছিলাম ! কারুর ওপর রাগ করে না খেয়ে থাকবো এমন বোকা আমি নই। যাই বলিস, ছোঁড়াটার ওপর রাগ করে কখনো না খেয়ে থাকিসনে পেটের কষ্ট বড় কষ্ট !—নিজের রসিকতায় নিজেই হাসিয়া উঠিয়া লাবণ্যলতা আসল কথা চাপিয়া গেলেন, আসলে তিনি খান নাই।

সতী মুচ্ কি হাসিয়া বলিল, সেই দুষ্টু ছোঁড়াটার কথা আর বলবেন না ঠাকুর মা, সে তো এখন জেলে পচছে !

—ষাট্, ষাট, ষাট্, কী যা মুখে আসে তাই বলিস, তোর কি এতটুকু মায়া দয়া নেই বাছা ?

সতী তবু মুচকিয়া হাসিতে লাগিল। একটু পরে হঠাৎ তাঁহারি কোলের কাছে শুইয়া পড়িয়া বলিল, একটী গল্প বলুন না, ঠাকুর মা ?

—আহা, আবার এখানে কেন ? এই ছেঁড়া, ময়লা বিছানায়—

—তা থাক, সতী অন্য কথা পাড়িল, আচ্ছা, বুড়ো আপনাকে খুব জ্বালাতন করতো, না ?

লাবণ্যলতা অন্যদিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন, কিছুক্ষণ পরে শুধু বলিলেন ছাই !

সতী তাঁহার মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল, একটু পরে শুনিতে পাইল লাবণ্যলতা বলিতেছেন : জ্বালাতন না ছাই ! সময় কোথায় ? রোজ রাত বারোটা-একটার পর খেয়ে দেয়ে শুলেও রাত থাকতে উঠতে হবে, নইলে রক্ষে নাই। তারপর আবার আড়াইটে-তিনটে অবধি বাড়ীশুদ্ধ সকলের খাওয়া-দাওয়া সেরে নিজেদের খাওয়া, চান করে খেতে-খেতে চারটে বাজতো, আবার সন্ধ্যে হতে-না-হতেই রান্নাঘরে ঢোকা। এক রাত্তির ছাড়া বুড়োর মুখ আর কখনো দেখিনি। এর মধ্যে আবার জ্বালাতন করা, মাঝে-মাঝে কথা বলা—হুঁ; গলায় দড়ি দিতে আর বাকি থাকবে ! কোনো-দিন অসুখ-বিসুখ হলে তোমার ঠাকুরদা একটিবার কাছে এসে বসলে চারদিক থেকে কতো রকমের কথা এসে তীরের মতো বিঁধতো—ওমাগো, এত করেও যশ নেই, নিজের চোখে না দেখলে বুঝি বিশ্বেস হয় না ! অবিশ্যি অসুখ-বিসুখ হলে তোর ঠাকুরদা একবারের জন্যেও কাছে এসে বসে নি, জ্বর ছাড়তে-না ছাড়তেই আবার ভোর থেকে মধ্য রাত অবধি সমানে হাঁড়ি ঠেলতে হয়েছে ! অসুখ হওয়াটাই যেন অপরাধ ! প্রায় চিরটা কাল এমনি কেটেছে, কাজ করে-করেও একটু আনমনা হবার উপায় নেই, কারুর আশায় বাইরের দিকে তাকাবার সাহস নেই। কিন্তু দিদি, সারা জীবনে এমন কয়েকটা দিনের কথাও জানি—তাহার চোখের দৃষ্টি আবার আচ্ছন্ন হইয়া আসিল, গলার স্বর বদলাইয়া গেল—যেসব দিনের কথা ভেবে আর সব

দুঃখকে ভুলেছি। সেসব দিনের কথা ভাবলে আমার নিজেরই একসময় আশ্চর্য্য মনে হয়। তাহলে শোন বলি। চোখ যখন আমার খারাপ হলো, তখন পঁয়ত্রিশ পার হয়ে আমি প্রায় বুড়ী হতে চলেছি। শরীর ভয়ানক ভেঙে পড়েছে, অত খাটনি আর সয় না। তবু মুখ ফুটে বলতে সাহস নেই। আর বললেই বা কী হতো ? তাহলেও কোনো উপায় ছিল না। চক্ষু খারাপ হলে পর সেই ভাঙা শরীর আধ খারাপ চক্ষু নিয়েই কিছুদিন সমস্ত কাজ করেছি, কিছুতেই কাউকে বোঝাতে পারিনি যে আমার কোনো অসুখ হয়েচে। কোনো সময় হয়তো কথাচ্ছলে জানালে তারা বলতেন, তোমার আবার অসুখ কি গো ! বেশ তো আছো, খাওয়া-দাওয়া তো বেশ হচ্ছে !—তবু কিছু বলিনি, চোখে না দেখার ভান করছি, এই অজুহতে সকলের হাসির কারণ হয়েও চুপ করে থেকেছি।

লাবণ্যলতা বলিয়া চলিলেন, কিন্তু যে রাতে আলো হাতে রান্নাঘর থেকে বার হবার সময় দরজার চৌকাঠে ঠেকে উঠোনে আছাড় খেয়ে পড়লাম, তখন ভারি কান্না পেলো, ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করলো। কিন্তু সই, যা পেয়ে তখনকার কান্না আমি ভুলেছি, সেকথা ভাবলে আজও ভারি আশ্চর্য মনে হয়। কার হাতের স্পর্শে টের পেয়েই চমকে মুখ তুলে দেখি, তোর ঠাকুরদা ! বড় আরামে তার হাতে ভর দিয়ে ঘরে এসে অনেকখন কাঁদলুম। সেদিন মনে হলো, এ সংসারে আমি আর একা নই, এমন একজন কেউ আছে যে আমাকে ভালোবাসে। শুনে তোর হাসি পাবে জানি, বিয়ের পর প্রায় সারাটা জীবন কাটিয়েও যখন কারুর এই প্রথম ভালোবাসার কথা মনে হয় ! কিন্তু বুড়ো বয়সে আমার সেই ভীমরতি হলো। সমস্ত লাঞ্ছনা-গঞ্জনা আমি ভুলে গেলাম, বুড়ো বয়সে এমন এক রাজ্যের রাণী আমি হলুম, যে রাজ্যে ঢোকবার অধিকার কারুর আগে ছিল না। সে বললে, ওগো, তুমি আগে আমায় জানাওনি কেন ? তোমার শরীর এমন খারাপ, এভাবে বিনে-চিকিচ্ছেয় দিন কাটালে যে একেবারে অন্ধ হয়ে যাবে ! আর কোনো চিকিচ্ছের কথা তো জানিনে

বৌ, যাকে খুব বড়ো চিকিচ্ছে বলে তখন মনে ভেবেছিলাম, সেই কথাই বলি। রাতে যখন কোনো কারণে বাইরে যাবার দরকার হয়েছে, তোর ঠাকুরদা হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন, সেই হাতে ভর দিয়ে আমি কোথায় যে যেতে হবে সেকথা ভুলেছি। শুনে হাসবি, শুধু বাইরে যাবার জন্যে সেই বুড়ো বয়সে মিথ্যে কথা বলবার লোভও সামলাতে পারিনি। রাত্তিরে জলতেষ্টা পেলে তাঁর হাতে জল খেয়ে এমন স্বাদ পেয়েছি, রোজই জলতেষ্টা পেয়েছে। খাওয়ার সময় কাছে বসে থেকে খাওয়ানোর কী যে আনন্দ হয়েছে, তা বলতে পারিনে।

সতী চুপ করিয়া শুনিতেছিল। লাবণ্যলতা বলিতে লাগিলেন, এমনি করে অনেকদিন কাটলো, তিন-চার মাসের কম নয়। সে দিন জ্যেৎস্না-রাত। গভীর রাতে কি কারণে যেন বাইরে বার হলাম, তোর ঠাকুরদা কাঁধে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করলে, কী সুন্দর জ্যোৎস্না, তুমি দেখতে পাচ্ছো, বৌ— আমি সবই দেখতে পাচ্ছিলাম, কিন্তু কিছু আবছা, কিছু অস্পস্ট। হঠাৎ তোর ঠাকুরদা আমার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বললে, তুমি আমায় দেখতে পাও, বৌ? বোন, শুধু সেই রাতটিতেই সবচেয়ে বেশি করে আমি আমার মহিমা টের পেয়েছিলুম। তারপর চক্ষুও ভালো হলো, শরীরও সারলো, কিন্তু যা আবার হারালাম, তা আর কিছুতেই সারবার নয়। তাঁর ভয়ানক জ্বর হলো, মাত্র তিন দিনের জ্বরে তাঁকে আমার ঘোমটার আড়াল থেকে বিদায় দিলুম। তারপর কতো বছর আজ হয়েছে, শকুণের আয়ু নিয়ে আজও বেঁচে আছি, কিন্তু সারা জীবনে, শুধু তোর কাছেই বলি বৌ, সারাজীবনে সেই ক'টা দিনের কথা কখনো ভুলতে পারিনে।

গল্প শেষ করিয়া লাবণ্যলতা সতীর গায়ে হাত রাখিয়া ডাকিলেন, ওরে বৌ, ঘুমিয়ে পড়লি?

সতী নিরুত্তর, ঘুমাইয়াছে কিনা বোঝা গেল না।

সেদিন অবনী রক্ষিতের মৃত্যু-বার্ষিকী। সেই উপলক্ষে কিছু লোক খাওয়ানো হয়। সবাই অতি সম্ভ্রান্ত আত্মীয়-স্বজন। এই দিনে মনোরমাকে

কৃচিৎ ঘরের বার হইতে দেখা যায়। রুদ্ধ ঘরে মৃত স্বামীর কথা স্মরণ করিয়া অচিরে নিজের মৃত্যু-কামনাই করেন তিনি। পুত্র সৌভাগ্যের গর্ব্বটা সজোড়ে চাপা দিয়া কোন অদৃশ্য দেবতার পায়ে মাথা ঠুকিতে থাকেন।

বধূদের ভিতর শুশ্রূষার প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। সমস্ত কাজ ফেলিয়া সেদিন তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া থাকে। কিন্তু চারদিকে শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া মনোরমার ক্লান্ত চোখের দৃষ্টি আরও অর্থহীন হইয়া আসে। সেজবৌ নাই যে! ক্ষীণস্বরে বলেন; সুলেখা কোথায় ?

সুলেখাকে তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হয়। সে আসিলে মনোরমা আবার কাতরস্বরে বলেন, তোমাদের বাসার সব এসেচে তো? তোমার মা বাবাকে অনেকদিন দেখিনি। ওদের ঠিক মতো আদর যত্ন করা হচ্ছে তো॥

লোকটা মস্ত বড়লোক, কণ্ট্রাক্টারী করিয়া বিস্তর পয়সা করিয়াছেন, অতি সজ্জন। সুলেখা তাঁহারই মেয়ে তো! এতক্ষণ পরে সেই সুলেখাকে হাতের কাছে পাইয়া মনোরমার দুই চোখে বিপুল বন্যা ছুটিল।

সন্ধ্যার পরে স্বল্প অন্ধকারে এক নীরব ছায়ামূর্তির মতো সতী বারান্দার রেলিং ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। আকাশে অজস্র তারা। মাঝে-মাঝে মিষ্টি বাতাসের ঝলক আসিয়া চোখে মুখে ছড়াইয়া পড়ে, দুইপাশের ভাঙা চুলগুলি গালের পাশে কাঁপিতে থাকে। রাস্তার ওইপাশের বাড়ীটিতে ইউক্যালিপ্টাস গাছের সারি, মস্ত লম্বা—যেন আকাশ ছুঁইতে আর বাকি নাই। সেই গাছের চারদিকে গাড়তর অন্ধকারের আবরণ। বাড়ীর প্রতি জানালায় উজ্জল আলো, কোথাও দীপ্ত কক্ষের আভাষ। এই দালানের অভ্যন্তরেও লোকজন আর ছোটো ছেলেমেয়েদের চেঁচামিচি। চারদিকে বিশৃঙ্খল দৃষ্টিতে চাহিয়া চাহিয়া কোন্ সময় সতীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। পাশের আনন্দ কোলাহল হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়াও সতীর ওই ঘরের নিঃশব্দতাটুকু স্পষ্ট ধরা পড়ে। ঘরের আলো নিবাইয়া বারান্দার রেলিংএ

ভর দিয়া সতী দাঁড়াইয়া আছে। চারপাশে শূন্যতায় খাঁ খাঁ করে নিস্তব্ধ এই অন্ধকারের পটভূমিকায় কাহারও মূর্তি আজ চোখে পড়ে না, এই অন্ধকারের প্রসন্নতায় কেউ আসিয়া মুখোমুখি দাঁড়ায় না। সতী আঁচল টানিয়া মুখে চাপিয়া ধরিল।

কতোক্ষণ সেইভাবে সে দাঁড়াইয়া ছিল, ঠিক খেয়াল নাই, চমক ভাঙিল নীলার ডাকে।—এখানে দাঁড়িয়ে কেন ভাই বৌদি?

গলার স্বর যথাসম্ভব অবিকৃত রাখিয়া সতী বলিল, এমনি।

—এমনি? নীলা কাছে আসিয়া তাহার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইল।

কিন্তু এত ঘনিষ্ঠতায় ধরা পড়িবার ভয়ে সতী চকিতে পাশ কাটাইয়া সরিয়া আসিল। 'একটা কাজ সেরে আসি ভাই, এখুনি আসছি,'—এই বলিয়া দীর্ঘ বারান্দা দ্রুত অতিক্রম করিতে লাগিল।

নীলা তো অবাক! সতীর স্বর-বিকৃতি তাহার কাছে ধরা পড়ে নাই এমন নয়।

সিঁড়ি দিয়া নামিতে পেছন হইতে বড়-বৌ বলিল, ছোটোবৌ, শোনো তো!

কিন্তু সতীর কোনোদিকেই খেয়াল ছিল না, তর তর করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া সে তখন নিচে নামিয়া গিয়াছে।

ছেলে বুকে করিয়া বড়বৌ নাক সিঁটকাইলেন। আহা, দেমাক ত্মাখো মেয়ের!

লাবণ্যলতার ঘরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ধীরে অগ্রসর হইয়া সতী ডাকিল, ঠাকুরমা?

কোনো উত্তর নাই। কেবল একটা ক্ষীণ প্রতিধ্বনি ফিরিয়া আসিল।

সতী আবার ডাকিল, ঠাকুরমা?

তবুও উত্তর নাই।

ভয়ে-ভয়ে আরও কিছুটা অগ্রসর হইয়া বিছানার উপর হাত রাখিয়া

সতী দেখিল, না, লাবণ্যলতা শুইয়াই আছেন। মুখের কাছে মুখ নিয়া আবার সে ডাকিল, ঠাকুরমা কতো ঘুমুচ্ছেন ?

তবুও কোনো উত্তর নাই। সভয়ে লাবণ্যলতার চোখে-মুখে-বুকে দুটী শিথিল হাতে হাত বুলাইয়া সতীরও সারা দেহ হিম হইয়া আসিল। চার পাশে জমাট-বাঁধা সারি-সারি অন্ধকারের ভয়গুলি যেন তাড়া করিয়া আসিল তাহাকে। চিৎকার করিয়া আবার ডাকিতে গেল, 'ঠাকুরমা', কিন্তু পারিল না। কে যেন খুব চাপিয়া ধরিয়াছে তাহার গলা। ভয় আর দুর্বোধ্য বিস্ময়ে তাহার দীর্ঘায়ত চোখ বেদনায় বুজিয়া আসিল। সতী বৃদ্ধা লাবণ্যলতার কুঞ্চিত হিম শীতল দেহের উপর ঢলিয়া পড়িল।

পরদিন অনেক চেঁচামিচি, নতুন বিষয়ে এক নতুন কোলাহল। কথায় কথায় উঠিল : বুড়ীর জ্বর হইয়াছে, পরশুদিন নাকি ইহা কার মুখে শোনা গিয়াছিল। মনোরমা বলিলেন, আহা, এতখানি বয়সে বুড়ী কী সুখেই না মরলো ! এবং নিজের কপালে করাঘাত করিলেন, আর শুধু তাহার বেলায়ই কি মৃত্যুর দেবতা পথ ভুল করিয়াছেন !

সতী তাহার রুদ্ধ গৃহাভ্যন্তরে কতোক্ষণ জাগিয়াছিল, আর কতোক্ষণই বা শুইয়াছিল, সে নিজেও জানে না। তখন রাত বারোটার কম হইবে না। কাপড়টি সর্বাঙ্গে ভালো করিয়া জড়াইয়া (যেন শীতার্ত্ত কোনো রাত্রি) সতী ঘরের বাহির হইয়া আসিল। চারদিক থম্ থম্ করে, টু শব্দও শোনা যায় না। দীর্ঘ বারান্দা পার হইয়া সে সিঁড়ির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। উজ্জ্বল আলোকিত সিঁড়িপথ। সতী নামিতে লাগিল।

'বৌদি ?'

সতী ফিরিয়া তাকাইল : তাহার ঘরের কাছে বারান্দায় এই রাত্রে একাকী পায়চারি করিতেছে নীলা।

নীলা বলিল, কোথায় যাচ্ছো ভাই, বৌদি ?

—ঠাকুরমার জর হয়েছে, সে কি জানো না? বোধ হয় জ্বরে ছট্‌ফট্‌ করছে এখন, একটু দেখতে যাই।

নীলা তাড়াতাড়ি তাহার কাছে গিয়া দুই হাতে তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, চলো, আমার ঘরে শোবে চলো।

সতী তাহার দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। নীলা দেখিল, তাহার দুই চোখে জল, ইলেকট্রিক্‌ আলোয় চিক্‌ চিক্‌ করিতেছে।

বনস্পতি

এত বড় বটগাছ সচরাচর দেখা যায় না। পীরপুরের হাটকে যদি চিনিতে হয়, তবে যে-কোনো অশীতিপর ক্ষীণদৃষ্টি বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলেও ইহার উত্তর মিলিবে ; দূরে সে যতদূরেই হোক না কেন, যেন আকাশেরও প্রায় অর্ধেক ছাইয়া আছে, এমন একটা দৈত্যের মতো প্রকাণ্ড গোলাকার গাছের দিকে দারুণ তৎপরতায় শীর্ণ হাতটি উঠাইয়া সে বলিবে, 'আরে, তুমি কি কাণা? ওই দৈত্যিটার বরাবর চলে যেতে পারো না?' যাহাকে বলা হইবে, সে যেন কোনো ব্যবসায়ী, ওই হাটের দিকেই যাইতেছে, আর কোনো উদ্দেশ্য তাহার নাই! পীরপুর গ্রামটি অন্যান্য গ্রামের মতো নয়, সেখানে কেউ ঘর বাধিয়া বাস করিতে পারে, একথা কেউ ভুলেও কল্পনা করিতে পারে না। কেবল একটি হাট নিয়াই যেন সারাটি গ্রাম। কেবল সারি-সারি টিনে ছাওয়া ছোট-ছোটো ঘর, মাঝখানে সরু ক্ষত-বিক্ষত পথ, বটগাছের আশ্রয়ে চারদিক চমৎকার ছায়াচ্ছন্ন, হাটবার আসিলে রাত থাকিতেই নৌকার পর নৌকার ভিড়, তারপর সারা দিন আর রাত কেবল সমুদ্রের কালোচ্ছাস। সেই কালোচ্ছাসের সঙ্গে কিছুমাত্র পরিচয় যাহাদের নাই, অথবা যে-কোনো উপায়ে হোক সেই জনসমুদ্রের কিছুমাত্র আভাষ যাহারা পায় নাই, তাহাদের পক্ষে তেমন দৃশ্যের কল্পনা করা সুকঠিন।

আশে-পাশের দশ-বারোটা গ্রাম হইতে পীরপুরের এই হাট চোখে পড়ে। সেই গ্রামগুলি আর এই হাটের মাঝখানে প্রায় দুই মাইল ব্যাপী একখানা নদী আর সারি-সারি অনেকগুলি বিল। বর্ষাকালে এই বিলগুলি আর নদীতে মিলিয়া যে অবস্থা হয়, সে কথা মনে করিতে হইলে, কেবল কোনো সমুদ্রের সঙ্গেই তুলনা করা চলে। ওপারকে মনে হয়, কোনো রহস্যময়,

কুয়াসাচ্ছন্ন পৃথিবী, বিপুল রহস্যের ফেনা সারা গায়ে মাখিয়া এপারের পৃথিবীর সন্তানদের চোখে ধাঁধা লাগাইতেছে, ইহাও মনে হয়, আকাশের সীমারেখায় তাহা কোনো ধূসরবর্ণের পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের রাশি অন্যান্য মেঘের মতো যাযাবর নয়। সেই দুইপারের মাঝখানে বিস্তীর্ণ জলরাশি আরও দুর্বোধ্য। সারাক্ষণ কেবল দুই পারের মানুষকে ভীষণ শাসাইতেছে। তারপর বাতাস বহিতে থাকে, বিশাল জলরাশিতে এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত নৌকাগুলি শাদা এবং আরও নানারকমের রঙিন পাল মেলিয়া যেন পাখায় ভর দিয়া উড়িয়া আসিতে থাকে, বটগাছের শত-শত ডালের ভিতর রক্তের জোয়ার আসে, কোটী-কোটী পাতা মৃদু কাঁপিতে থাকে। তারপর কোনো একসময় হয়তো শীতের আবির্ভাব, মাথার উপর কাঠফাটা রৌদ্র, সমুদ্রের বুক দেখা যায়—কঠিন, ক্ষত-বিক্ষত কোথাও উঁচু, কোথাও নিচু, সেখানে আগুন জ্বলিতে থাকে, বাতাস ক্ষেপিয়া যায়, বটগাছের নিচে অজস্র শুকনো পাতার রাশি। একটী মুসলমান বুড়ী মাঝে-মাঝে সেই পাতাগুলি ঝাড় দিয়া নেয়।

প্রায় দুই-শ' বছর আগে চলিয়া যাইতে হয়। তখন ১৭৫০ সাল। তখনো সমগ্র ভারতবর্ষের কেন, কেবলমাত্র বাংলাদেশের শাসনভারও জনকতক হিন্দু শ্রেষ্ঠীর চেষ্টায় ইংরেজ বণিকের হাতে চলিয়া আসে নাই, তাহাদের ব্যবসায়-প্রতিষ্ঠান ইষ্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানি তখনো প্রকৃত শাসন-প্রতিষ্ঠান হইয়া উঠিতে পারে নাই, এমন দিনে এক রাত্রে পীরপুরের বৃদ্ধ জমিদার নবকিশোর চৌধুরী তাঁহার শয্যা-সঙ্গিনী তৃতীয়পক্ষের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীকে নিয়া বড় বিব্রত বোধ করিলেন, একটা ভয়ানক উত্তাপে এক মুহূর্তে কি জানি কেন সমস্ত শরীরটা তাহার দারুণ অবশ হইয়া আসিল, কেমন একটা অবসাদে ভরিয়া গেল, তিনি বড় অসহায় বোধ করিলেন, ইচ্ছা হইল দুই হাত দিয়া নিজেই নিজের চুল ছিঁড়িতে থাকেন, গুটি-গুটি মারিয়া তিনি পড়িয়া রহিলেন।

রাত তখন দুইটা। চারদিক গভীর নিস্তব্ধ, কোথাও টু শব্দটি শোনা যায় না। সামনের জানালা দিয়া বাগান হইতে তীব্র ফুলের গন্ধ আসিতেছে। বিছানায় বালিশের পাশেও নানা-রকমের ফুল, কিন্তু নবকিশোরের কাছে তাহা এখন বিষের মতো মনে হইল, তীক্ষ্ণ কাঁটার মতো, তাঁহাকে সুঁচের মতো বিঁধিতেছে। পাশেই অরুন্ধতী তাহার প্রখর যৌবন আর চেহারার দীপ্তি নিয়া মুখ ফিরাইয়া শুইয়া আছে। নবকিশোরের ইচ্ছা হইল ডাক ছাড়িয়া কাঁদেন। তাঁহার মাথা ঘুরিতে লাগিল, তিনি ঘামিতে লাগিলেন। আস্তে-আস্তে তিনটা বাজিয়া গেল, হয়তো রাতকে দিন ভাবিয়া কয়েকটা কাক বাইরে কা-কা করিতেছে, কাঁটার বিছানায় শুইয়াও নবকিশোর এক সময় ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুমাইয়া স্বপ্ন দেখিলেন, তাঁহার আশে-পাশে একদল নগ্ন নর-নারী, চমৎকার তাহাদের চেহারা যেন শ্বেত-পাথরে খোদা মূর্তি, চমৎকার চোখে-মুখের ভঙ্গি, যেন অজস্র মাণিক ঝরিতেছে, নবকিশোর দেখিলেন, খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া তাহারা একজন আর একজনের সঙ্গে কথা বলিতেছে, অজস্র চুমা খাইতেছে, কেউ হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া কোনো মেয়ের হাঁটুতে মুখ রাখিয়া কী সব বলিতেছে, কেউ বুকের উপর মুখ গুজিয়া পড়িয়া রহিয়াছে—আর সেই একদল হাস্যমুখর, সৌন্দর্য-দীপ্ত মানুষের মধ্যে সে যেন একটি ভেড়া! এমন সময় নবকিশোর হঠাৎ জাগিয়া উঠিলেন, অসহায়তার তুলনা তো নাই, শরীরটাকে আরও অবসাদগ্রস্ত বোধ করিলেন। ঘরের এক কোণে বাতি জ্বলিতেছে, মিট্ মিট্ করিয়া চাহিয়া তিনি দেখিলেন, আশ্চর্য, বিছানা খালি, পাশে তাঁহার স্ত্রী সুন্দরী অরুন্ধতী নাই, ঘরের দরজা হা হা খোলা, হুর্ হুর্ করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস আসিতেছে। ব্যাপার দেখিয়া তাঁহার চোখের পাতা আর ভ্রূ কুচ্‌কাইয়া আসিল, তিনি খাট হইতে নামিয়া দরজার কাছে আসিলেন, আস্তে ডাকিলেন বৌ?

কিন্তু কোনো উত্তর নাই, শুধু তাঁহার গলাটাকেই এই নিস্তব্ধতায় ভীষণ বিকৃত শুনাইল। আবার আরও জোরে ডাকিলেন, বৌ ? বৌ ?

তবু কোনো উত্তর নাই। নবকিশোরের প্রশস্ত কপাল আরও কুচ্‌কাইয়া আসিল, ঘর হইতে বার হইয়া তিনি এখানে-সেখানে অরুন্ধতীকে খুঁজিতে লাগিলেন, বাগানেও অনেক খুঁজিলেন, পুকুরের ঘাটের কাছে গিয়া ডাকিলেন, বৌ ? ও বৌ ?—কিন্তু অন্ধকারে কেবল প্রতিধ্বনিই ফিরিয়া আসিল। নবকিশোর ভাবনায় পড়িলেন। হঠাৎ চোখে পড়িল, ছেলে সুরেন্দ্রকিশোরের ঘরে আলো জ্বলিতেছে, আর সেখানে কোনো মেয়েলীস্বরে কথাবার্তার আওয়াজও শোনা যায়। ধীরে-ধীরে তিনি অগ্রসর হইলেন, বুক তাঁহার দুরু দুরু কাঁপিতেছে। ঘরের ভিতরের কথাবার্তার শব্দ আরও স্পষ্ট হইয়া উঠিল, আর কোনো সন্দেহ রহিল না, তবু একবার উঁকি মারিয়া যা দেখিলেন, তাতে রাগে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিতে লাগিল, হাত-পা কাঁপিতে লাগিল,—পীরপুরের চৌধুরী-পরিবারের ভাগ্যে আজ এ কী অভিশাপ, হায়, আজ এ কী দুরপণেয় কলঙ্কের ইতিহাস তাঁহাকেই বিশেষ করিয়া দেখিতে হইল, তাঁহার তৃতীয়-পক্ষের স্ত্রী সুন্দরী অরুন্ধতীর সঙ্গে এক বিছানায় শুইয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া প্রেমালাপ করিতেছে তাঁহারই একমাত্র ছেলে সুরেন্দ্রকিশোর !

পরদিন অরুন্ধতী বা সুরেন্দ্র আর কাহাকেও বাড়ীর ত্রিসীমানায় দেখা গেল না এবং পরেও আর কোনোদিন দেখা যায় নাই। কেন এমন হইল, কিছুটা অনুমান করা যায় বটে, সম্পূর্ণ জানা যায় না। তবে জনশ্রুতি এই যে, নবকিশোর নাকি অরুন্ধতীকে রূপকথার রাজাদের মতো একেবারে মাটি-চাপা না দিলেও এমন কিছু একটা করিয়াছেন যাতে সেই দুর্ভাগা মেয়ের মৃত্যু ঘটিয়াছে। মৃত্যুটা কল্পনা করিতে পারি এইরূপ : মস্ত বড় দালানের যেদিকটা বেশ একটু নির্জন, আর গাছপালার ছায়ায় বেশ গম্ভীর, সেখানে

একটা সুন্দর ঘর আছে। ঘরটি চমৎকার সাজানো। মেঝেয় দামি ফরাস আর বালিশের ছড়াছড়ি, বাতাসে সুগন্ধ। চারিদিকে কেমন একটা নির্জন ভয়াবহতা, মাটিতে সূঁচটি পড়িলে শোনা যায়। এই ঘরের এক বিপুল ইতিহাস আছে। পয়তাল্লিশ বছর আগে হইতে সেই ইতিহাসের সুরু। নবকিশোর তাঁহার সারা রাজ্য জুড়িয়া একটি জাল তৈরী করিয়াছিলেন, সেই জালে যে মেয়েগুলি ধরা পড়িত, তাহাদের ধরিয়া আনা হইত এই ঘরে—সকলের চোখেই পাগলের মতো দৃষ্টি, নয় তো নিতান্তই ছেলেমানুষ হইলে সারা মুখ চোখের জলে ভেজা, মাথার চুল আর পরণের কাপড় এলোমেলো, আত্মসমর্পনের ইচ্ছা মোটেই না থাকিলেও আত্মরক্ষায় নিশ্চেষ্ট। নবকিশোর তাহাদের কোনো কূলই রক্ষা করিতেন না, কেবল পথে বসাইয়া দিতেন। সেই মেয়েগুলি তখন পথে-পথে ঘুরিয়া বেড়াইত, না হয় গ্রামের হাটে-হাটে কোনো বিশেষ পল্লীতে আশ্রয় নিয়া বাঁচিত। এভাবে অনেক মেয়ের কুমারী অথবা বধূ-জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটিয়াছে। কিন্তু তাহাদের মৃত্যু দেখিয়া নবকিশোর বিন্দুমাত্র বিব্রত নন, তাহাদের অভিশাপ আর বেদনার রক্ত গায়ে মাখিয়া তিনি এতটুকু বিচলিত হন নাই, বরং তাহাদের দেহ নিয়া আর একবার ছিনিমিনি খেলিয়াছেন, একদিকে লাথি মারিয়া আর একবার সর্বনাশ করিয়া ছাড়িয়া দিয়াছেন। নবকিশোর সুদীর্ঘ জীবন, আর সেই জীবনের সঙ্গে জড়িত এই ঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই। এখন সেই ঘর তত ব্যবহৃত হয় না, মাঝে-মাঝে মেঝেয় ধূলি পড়ে। তার মূলে একমাত্র কারণ হয় তো বার্ধক্যের অক্ষমতা এবং সেই কারণে আগের মতো প্রচুর উৎসাহের অভাব। কিন্তু সেদিন যে কাণ্ড ঘটিল তাকে সত্যই অদ্ভুত বলা চলে। ঘটনাটি গতানুগতিক পথ ধরিয়া ঘটে নাই। নবকিশোর এই ঘরের কথা মনে করিয়াই স্ত্রীর জন্য উপযুক্ত শাস্তি খুঁজিয়া পাইলেন। অরুন্ধতী পরম গাম্ভীর্যে ঘরে ঢুকিল, নবকিশোর বাহির হইতে দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং অনেকদিন পর্যন্ত আর খুলিলেন না। অরুন্ধতী প্রথমে অনেক

ধাক্কাইয়াছিল, তারপর কাঁদিয়া দিল বাগানের সেই নির্জন অংশ তাহার উচ্ছ্বসিত কান্নায় থম্ থম্ করিতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিতে-কাঁদিতেও একসময় ক্লান্তি আসে, তাহার গলার স্বর একদিন আর শোনা গেল না।

এবং ইহার কয়েকদিন পরেই দেখা গেল নদীর পারে একটা চমৎকার খোলা জায়গা বাছিয়া সেখানে নবকিশোর দুটি বট-অশথের চারা এক সঙ্গে পুতিয়া দিলেন, তারপর সেই গাছে অনেক সিঁদুর মাখিয়া, নতুন কাপড় পরাইয়া বিরাট সমারোহে পূজা করিলেন, আশে-পাশের বিভিন্ন গাঁ হইতে হাজার হাজার প্রজা আসিয়া তাঁহার সেই পূজা দেখিল, অজ্ঞাত নিরুদ্দেশ দেবতার উদ্দেশ্যে ভক্তিভরে প্রণাম করিল, ধূপের ধোঁয়ায় আর মানুষের কোলাহলে কত ছাগশিশুর চিৎকার আর কান্না শুনিয়াও শোনা গেল না, ধূসর মাটি রক্তে ভাসিয়া গেল, নবকিশোর মাটিতে গড়াগড়ি দিয়া 'মা' 'মা' করিয়া অনেক ডাকিলেন।

বটগাছের জন্মের ইতিবৃত্ত মোটামুটিভাবে এই। কিন্তু এটুকু জানিবার চেষ্টাও জনসাধারণের নাই, গাছের মধ্যে দেবতার অংশ আছে, ইহা জানিতে পারিয়াই তাহারা খালাস।

তারপর বিখ্যাত ১৭৫৭ সাল। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে বাংলা অথবা ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ-ভাগ্য নিরুপিত হইয়া গেল। বাংলার ধনীরা ইংরেজের জয়লাভে আনন্দে আত্মহারা হইয়া গেলেন। অথচ পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র কতো নিরীহ দরিদ্রের রক্তে ভাসিয়া গেল। পীরপুরের একটি ছেলেও যে হতভাগা সিরাজের পক্ষে প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়াছিল, অশেষ বীরত্ব দেখাইয়াছিল, ইহা ইতিহাসের পাতায় লেখা না থাকিলেও পীরপুরের ছেলে-বুড়ো কে না জানে? তাহার নাম অর্জুন।

সেবার কোথা হইতে এক বাঘ আসিয়া সারাটা গ্রামে ভয়ানক উৎপাত সুরু করিয়া দিল, আজ এ-বাড়ীর ছাগলটা, কাল ও-বাড়ীর বাছুরটা প্রায়ই

পাওয়া যাইতে লাগিল না। বৃদ্ধ এবং শিশুরা ভয়ে ভয়ে আর সন্ধ্যার পর বাহির হইত না, গভীর রাত্রে কোনো গভীর সমস্যায় পড়িলেও কেউ ভুলেও দরজাটা একটু ফাঁক করিত না। হয়তো কখনো একটা বাছুর ভীষণ আর্তনাদ করিয়া কাঁদিয়া উঠিত, গরুগুলি প্রত্যুত্তরে 'মা' 'মা' করিয়া চিৎকার করিতে থাকিত, তারপরেই সব শেষ—এমন দৃশ্যের অভাব রহিল না। গ্রামের ভিতর একটা আতঙ্কের ছায়া পড়িয়া গেল। যে পথে বাঘের পায়ের ছাপের মতো কিছু চোখে পড়িত, সে পথে আর কেউ মাড়াইত না। কিন্তু এই দুঃসময়েও অর্জ্জুনের সাহস দেখিয়া সকলে অবাক হইয়াছিল—বাস্তবিক, এমন অসিম সাহসের পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়। সে একদিন সেই দুর্ধর্ষ বাঘটাকে সকলের পায়ের সামনে আনিয়া হাজির করিল। ব্যাপার দেখিয়া বৃদ্ধরা ধন্য-ধন্য করিতে লাগিলেন, তাহার মাথায় হাত রাখিয়া অনেক আশীর্ব্বাদ করিলেন এবং এমন ভবিষ্যৎবাণীও করিলেন যে, সে কালে একটা কিছু হইবে। মেয়েরা আড়ালে থাকিয়া তাহার চেহারার দিকে চাহিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইল। আশে-পাশের দু-চারখানা গ্রামেও এমন বীরত্বের কাহিনী মুহূর্তের মধ্যে প্রচার হইতে বাকি রহিল না। এমন কি স্বয়ং জমিদার-মহাশয়ও দারুণ খুশী হইয়া কিছু পুরস্কার দিলেন তাহাকে। কিন্তু সকল প্রশংসা-বৃষ্টির আড়ালে অর্জুনের জীবনে আর একটি ব্যাপার যা ঘটিল, তার তুলনা নাই। অর্থাৎ অর্জুন প্রেমে পড়িল। তাহার অথবা সেই মেয়েটির প্রেমের আসরে নামিবার প্রথম দৃশ্যটি এই: রামকুমার মণ্ডলের বাড়ীর সামনেই একটা পোড়ো বাড়ীর উঠানে মরা বাঘটাকে ফেলিয়া রাখা হইয়াছিল। রোজই সেখানে কিছু না কিছু লোক জমিয়াই থাকিত। রামকুমারের বড় মেয়ে চম্পক একদিন সেখানে গিয়া হাজির হইল, বাঘটার চারদিকে চড়কির মতো কয়েকবার পাক খাইয়া, নাকে কাপড় দিয়া এখানে-সেখানে থু-থু ফেলিয়া অত্যন্ত ঘৃণাভরে বলিল, 'বারে, বাঘের গায়ে এমুন গন্ধ

কেন ? এমন কাণ্ড তো আর দেখি নাই জীবনেও। বাঘের গায়ে এমন গন্ধ কেন ?'—কাছেই ছিল অর্জুন ব্যাপার দেখিয়া সে কিছুতেই হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিল না, ফিক্ করিয়া হাসিয়া দিল, হাসি থামিলে শেষে আবার দারুণ গম্ভীর হইয়া এমন একটা তুচ্ছ বিষয়ও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে বুঝাইয়া দিল। কিন্তু চম্পক তো অবাক ! এমন দরদভরা স্বরে কেউ অনেককাল তাহার সঙ্গে কথা বলে নাই। সে আরও তাহাকে দেখিয়াছে বটে কিন্তু ভালো করিয়া দেখে নাই, আজ নতুন করিয়া দেখিল, দেখিল, যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বীর আসিয়াছে, তাহার চুল এলোমেলো, মুখ ভরা হাসি, হাতে খোলা তরবারি, আর ঢাল, এখন শুধু বরণ করিতেই বাকি। বীর যুবককে বরণ করিবার লোক এখন কোথায় ? চম্পক হা করিয়া চাহিয়া রহিল, কোনো হরিণশিশুর মতো তাহার চোখের দৃষ্টি।

তারপর প্রেমের দ্বিতীয় দৃশ্যের কথাও বলিতে হয়। রামকুমারের বাড়ীতে একদিন ভীষণ কীর্তনের আয়োজন করা হইয়াছে, গ্রামের অনেকেই আসিয়া কীর্তনে যোগ দিয়াছে, অর্জুনও আসিয়াছে। চম্পক আর স্থির থাকিতে পারিল না, চুপি-চুপি কখন কীর্তনের আসরের কাছে গিয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিতে অর্জুনকে ডাকিল, অর্জুন আসিল—কিন্তু কাছে আসিলে পর চম্পক আর কিছু বলিতে পারে না, মাটির দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া থাকে। এখানে বলিয়া রাখা ভালো চম্পকের মাথায় কিছু ছিট্ আছে, সে 'হাঁ' বলিলে মাঝে-মাঝে তার অর্থ হয় 'না', 'না' বলিলে অর্থ হয় 'হাঁ'। অনেক সময় ভুলেও সে চুল বাঁধিত না, আবার একসময় যখন-তখন চুল বাঁধিত। বছর চারেক আগে স্বামী তাহার জলে ডুবিয়া মারা গিয়াছে। স্বামী জলে ডুবিয়া মরিলে স্ত্রীকে কপালে সিঁদুর মাখিয়া বারো বছর অপেক্ষা করিতে হয়, চম্পকও অপেক্ষা করিতেছিল। এখন বয়স তাহার সতেরো। এককালে স্বামীর মৃত্যুসংবাদ পাইয়া সে পাগলামি করিয়া এখানে-সেখানে আছাড়

খাইয়া অনেক কাঁদিয়াছিল কিন্তু অর্জুনের ছায়ার আশ্রয়ে এই পাগলামি এখন অনেক কমিয়াছে। সে যেন নতুন পৃথিবীতে পা ফেলিল. জলের আয়নায় নিজের চেহারা দেখিয়া নিজেরই এখন আর বিশ্বাস হয় না, চোখের দৃষ্টি আচ্ছন্ন হইয়া আসে, আমগাছের নিচে শুক্‌নো পাতার মর্মর শব্দ সে প্রাণ ভরিয়া শোনে।

খুব দ্রুত পদক্ষেপের মতো অনেকগুলি দিন কাটিয়া গেল। কিন্তু একসময় বিদায়ের পালা আসে। একদিন চমৎকার সাজিয়া-গুজিয়া এক বিদেশগামী নৌকায় অর্জুন চড়িয়া বসিল। দূর হইতে দারুণ চোখের জলে ভিজিয়া চম্পক দেখিল, বীরকুমার আবার যুদ্ধে যাইতেছে, এবারও সে জয়লাভ করিবে নিশ্চয়।

নদীর ঘাট হইতে কিছুদূরেই সেই বটগাছ। এখন কিছুটা বড় হইয়াছে। পাতাগুলি কচি, চমৎকার চক্‌ চক্‌ করে। রোদ খুব তীব্র হইয়া উঠিলে, ভাঙা-ভাঙা ছায়া মাটিতে পড়ে। দুই-একটি ডালের ভিতর দিয়া সূতার মতো সরু শিকড় বাহির হইয়াছে। গাছের গোড়ার দিকটা সিঁদুরে লাল, আর সেই গোড়ার মাটিও প্রচুর দুধ আর তেল খাইয়া কালো রঙ ধরিয়াছে। মাঝে-মাঝে দেখা যায়, এই গাছের নিচে অনেক সময় একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়ায়,—তাহার চুল এলোমেলো চোখদুটি কাহার প্রতীক্ষায় আকুল। সে চম্পক। চম্পক মাটিতে কপাল ঠেকাইয়া সেই দেবাংশী গাছের উদ্দেশ্যে অনেক প্রার্থনা জানায়, বিড় বিড় করিয়া বলে, জয়ের মালা পরিয়া তাহার অর্জুন যেন শীগ্‌গিরই ফিরিয়া আসে, সে আবার তাহাকে বরণ করিয়া নিবে, তাহার বুকের ছায়ায় সেই বীরকে আশ্রয় দিবে! চম্পকের বুকের ভিতরটা হঠাৎ কেমন করিয়া উঠিল, স্তনের ভিতরও কেমন একটা যন্ত্রণা, দুই হাতে সে তাহার স্তন চাপিয়া ধরিল।

চম্পক নদীর পারে আসিয়া দাঁড়ায়, চোখ ছোটো করিয়া বহুদূর পর্যন্ত চাহিয়া থাকে, চোখের দৃষ্টি কখনো ভাঙিয়া আসিলেও সে নিজে কখনো

ভাঙ্গে না, বর্ষার ক্ষিপ্ত নদীর ঢেউ পায়ের উপর আসিয়া আছাড় খায়, বর্ষা যায় শীত আসে, শীত যায় আবার বর্ষা আসে,—তবু অর্জুন আসে না; বছরের পর বছর ঘুরিয়া গেল, বটগাছ আরও বাড়িয়া ডাল-পালা মেলিয়া মাটিতে দীর্ঘতর ছায়া বিস্তার করিল, গ্রামের কোথাও দারুণ জঙ্গলে ভরিয়া গেল, কোথাও মানুষের পদক্ষেপে পরিস্কার হইল, গ্রামে আবার বাঘ দেখা দিল, অনেক ছাগল-বাছুর খাইল—তবু অর্জুন আসে না। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে স্বাধীনতার লড়াই করিয়া সে প্রাণ দিয়াছে।

নদীর পারে দাঁড়াইয়া থাকিতে-থাকিতে চম্পকের শরীরও একদিন ভাঙ্গিয়া আসে, সে আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে না। একদিন দেখা গেল, রামকুমার মণ্ডলের বড় মেয়ে চম্পক নদীর বিক্ষুব্ধ জলে ঝাপাইয়া পড়িয়াছে, প্রাণপণে সে সাঁতরাইতেছে। নদীর ঢেউ-এর আঘাতে খোপা তাহার খুলিয়া গেল, জলের তালে-তালে নাচিতে লাগিল। চম্পক সেই যে জলে নামিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসে নাই।

তারপর ১১৭৬ সাল। সেবার বাঙলার আকাশে এক গভীর দুঃস্বপ্ন দেখা দিয়াছিল। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরের কথা আজও লোকে অত্যন্ত ভয়ে-ভয়ে স্মরণ করে। এই সভ্যতার দিনে এক যুদ্ধ ছাড়া আর কোনো উপায়ে এমন প্রাণহানি ঘটিয়াছে কি না সন্দেহ। না খাইতে পাইয়া সেবার বাঙলার এক-তৃতীয়াংশ লোক মরিয়া গেল। শুধু 'মরিয়া গেল' বলিলে মৃত্যুটা বড় সহজই শোনায়। সেই মৃত্যুর দৃশ্যগুলি এত করুণ আর এত ভয়াবহ যে শুনিলে শরীর কাঁটা দিয়া ওঠে। তবু অত্যাচারের সীমা নাই। তখন রাজস্ব আদায়ের যারা মালিক, তাহারা আরও দ্বিগুণ উৎসাহে এবং পরিমাণে রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল। তাহাদের অত্যাচারে লোকে ঘর ছাড়িয়া পলাইল, স্ত্রী-কন্যা বেচিয়া খাইল, অথবা আত্মহত্যা করিয়া বাঁচিল। মরা মানুষের হাড়ে পথ-ঘাট ভরিয়া গেল, আবার এমন দৃশ্যের কথাও কল্পনা করা যায় যে, সাধারণ কুকুরও সেদিন ক্ষুধায় কাতর হইয়া মানুষকে তাড়া করিতেছে।

এমন দিনে পীরপুরের লোকগুলির অবস্থাও কম ভয়ানক নয়। সারা গাঁয়ে দিনের বেলায়ও টু শব্দটি শোনা যায় না। কারুর মুখে কোনো কথা নাই, সকলেই কেবল একে-অন্যের দিকে হা করিয়া চাহিয়া থাকে, তাহারা আজ কাঁদিতেও ভয় পায়। মাঝে-মাঝে কেবল কুকুরের কাতর ডাক শোনা যায়। কুকুরের ডাক আজ মৃত্যুর চেয়েও ভয়াবহ। সেখানকার বৃদ্ধরা তখন কেবল তাহাদের দীর্ঘ, শীর্ণ আঙুল দিয়া মাটিতে আঁক কষিতেছে, প্রৌঢ়রা আর কোনো উপায় না দেখিয়া স্ত্রীর মাংসপিণ্ডকেই জীবনের সার বলিয়া জানিল, যুবকরা মাঠে-মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। মেয়েদের বেণী রচনায় আর সাধ নাই, কপালে টিপ দিতে আর পায়ে আলতা পরিতেও ইচ্ছা জাগে না।

একদিন এই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের দল সেই বটগাছের নিচে আসিয়া সমবেত হইল, বড়-বড় উস্ক-খুস্ক চুলে ভরা অনেকগুলি মাথায় সেই খোলা জায়গাটি ভরিয়া গেল, সেই মাথাগুলি কোন গভীর প্রার্থনায় নতমুখী। দেবাংশী গাছের দিকে চাহিয়া তাহারা অনেক প্রার্থনা করিতে লাগিল।

তারপর আরও অনেকগুলি বছর কাটিয়া গিয়াছে, প্রায় একশ' বছরের কাছাকাছি এতদিনে পৃথিবীর অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, পীরপুরেরও। আগে যাহারা ছিল, এখন তাহারা নাই। এখন যাহারা আছে, তাহারা আর একদল লোক, কিন্তু তাহাদের রক্তে একই মানুষের রক্তের প্রবাহ বহিতেছে। সেই বটগাছকেও আর চিনিবার যো নাই। একদিন যা ছিল নিতান্ত শিশু, সে এখন বড় হইয়া প্রকাণ্ড ছায়া বিস্তার করিতেছে। পাতাগুলি এত ঘন যে আকাশও অনেক সময় দেখা যায় না। এখানে সেখানে মোটা-মোটা শিকড়, মাটির রস পান করিতে অতৃপ্তি নাই। গাছের ছায়া এত নিবিড় যে গ্রামের ছেলেরা ইহার নিচে বসিয়া আড্ডা মারে, শীতকালে এখানে বসিয়াই আগুন পোহায়, ধোঁয়ায় তাহাদের মুখ ধূসর হইয়া আসে। এ ছাড়া গাছের নিচে দু-একটি ঘরও উঠিয়াছে। তার মধ্যে একটি মুদি দোকান।

এতদিন পীরপুরের এই বটগাছকে ঘিরিয়া কতো ঘটনা ঘটিয়া গেল, আরও কতো ঘটিবে কে জানে। এতকাল ওই গাছ গ্রামের দুই পুরুষ দেখিয়াছে; আরও দেখিবে।

১৮৫৭ সালে কানপুরে সিপাহী-বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিল, ধীরে ধীরে তাহা সারা ভারতবর্ষে ছড়াইয়া পড়িল, বাঙলায়ও সে ঢেউ আসিয়াছিল। সেই বিপ্লবের আগুন এত তীব্র হইয়াছিল যে শাসন যন্ত্রের চাকাও নড়িয়া উঠিয়াছিল। ঐতিহাসিক এমন কথাও বলেন, সেই বিপ্লবের যাঁরা পরিচালক ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে আর যা কিছুরই অভাব থাকুক আর নাই থাকুক, শৃঙ্খলার অভাব যথেষ্টই ছিল; তাই আজও আমরা ইংরেজের আমল দেখিতেছি। সেই বিদ্রোহের ইতিহাসকে আজও লোকে 'কালা-গোরার' যুদ্ধ বলিয়া স্মরণ করে। বিদ্রোহ-দমনের দৃশ্য তাহারা অনেক দেখিয়াছে বটে কিন্তু মুখ ফুটিয়া বলিতে সাহস করে না। তখন সকল সিপাহীদের কুকুরের মতো তাড়া করা হইত, তাহাদের প্রাণ-নাশের সমারোহ তখন খোলা আকাশের নিচেই হইত। অনেক ভারতবাসী তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছে।

একদিন একটা সিপাহী পীরপুরের বটগাছে আসিয়া আশ্রয় নিল। সে যেন কোনো পলায়নপর সিংহ, পালাইতেছে বটে কিন্তু তবুও তাহার চোখ-দুটি জ্বল্ জ্বল্ করে। মুখের রং গৌর, পেশীবহুল শরীর, হাত-পায়ে অপরিষ্কার কাঁদামাটির দাগ, পোষাক ক্ষত-বিক্ষত। লোকটা পূর্ণ একটা দিন সেই গাছের উপর লুকাইয়া রহিল। দুই-একজন যাহারা তাহাকে দেখিয়াছে, অনেক কাল তাহাকে ভুলিতে পারে নাই; সে ওইভাবে পলাইয়াও অত্যাচারীর হাত হইতে রেহাই পাইয়াছিল কিনা জানা যায় নাই।

তারপর আরও কয়েকটা বছর কাটিয়াছে। চিরকাল একই রকম যায় না। গ্রামে একবার ভয়ানক বসন্ত দেখা দিল। এমন একটি ঘর রহিল না যেখানে অন্তত একটাও বসন্তের রোগী নাই। প্রায়ই কোনো রাত্রি-

শেষে বা সন্ধ্যার অন্ধকারে ঘন-ঘন হরিধ্বনি শোনা যাইতে লাগিল। হঠাৎ শুনিলে গায়ে কাঁটা দিয়া ওঠে। নদীর পারের জল আর আকাশ শ্মশানের অগ্নিশিখায় লাল হইয়া গেল।

এমন চরম অসহায়তার দিনে গ্রামের অধিষ্ঠিত দেবতার কাছে প্রার্থনা করা ছাড়া আর উপায় নাই। গ্রামের সকলে আবার হাটু গাড়িয়া বসিল গাছের নিচে, প্রাণপণে প্রার্থনা করিতে লাগিল। কী কারণে দেবতা এমন রাগ করিয়াছেন কে জানে। সমস্ত গ্রামবাসী মিলিয়া দেবতার পায়ে ধরিয়া ক্ষমা চাহিল বলিল "হে দেবতা ক্ষমা করো। কোনদিন না বুঝিযা কী ভুল করিয়া ফেলিয়াছি, তুমি পিতা হইয়া তাহা ক্ষমা করো।"
—দেবতার পায়ের কাছে শত-শত পাঠা বলি দেওয়া হইল মাটীতে রক্তের নদী বহিয়া গেল।

দেবতাকে একবার রাগাইলে আর উপায় নাই, অনেক মূল্য দিয়া তবে সেই রাগ থামাইতে হয়। এমন অনেক বিপদ-আপদে যিনি পাশে আসিয়া দাঁড়ান, তাঁহাকে মাঝে-মাঝে খুসী না করিলে চলে না।

এদিকে দিনের পর দিন কাটিতে থাকে। আজ যা অতি আড়ম্বরে ঘটে, কাল তা মনেও থাকে না। কিছুই ধরিয়া রাখিবার উপায় নাই।

ধীরে-ধীরে দেশে বণিকদের নিজেদেরই প্রয়োজনে রেলপথের বিস্তার হইতে লাগিল। তাতে সাধারণ লোকেরও কিছু উপকার হইল বটে কিন্তু সেই কিঞ্চিৎ উপকারের বদলে যতোখানি অপকারের অভিশাপ আসিয়া দেখা দিল, সেই কারণে শুধু মালিকদেরই দোষ দেওয়া চলে। একটা যন্ত্রের কাছে যখন একটা ভয়ানক সুখের আশা করা অন্যায় নয়, সেখানে এই অভিশাপের ইতিহাস বড়োই করুণ। দেখা গেল, প্রতি ঘরে ম্যালেরিয়া বিরাজ করিতেছে এবং তাহার প্রতাপে প্রত্যেক মানুষের হাতের মুঠায় প্রাণ নিয়া ফিরিতে হয়। এমন কি ইহাতে শঙ্করও যে গ্রামের সকলকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইবে, ইহা অভাবনীয় হইলেও অস্বাভাবিক নয়।

সম্প্রতি চোরের মতো চুপি-চুপি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, শাদা কাপড় পরণে কে একটি মেয়ে প্রায়ই কোনো নির্জন সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রে ওই বটগাছের নিচে আসিয়া মাথা ঠুকিয়া কাঁদিতে থাকে। খোঁজ করিলে জানা যায়, সে শঙ্কর ভূঁইমালীর স্ত্রী সুকুমারী।

শঙ্কর তো এই সেদিনও সশরীরে বাঁচিয়া ছিল। তাহার মতো জোয়ান শরীর হাজারে একটা মেলে। সকলেই তাহাকে ভয় করিয়া চলিত। এছাড়া ঘর তৈরি করিতে এমন ওস্তাদ এ-অঞ্চলে আর দ্বিতীয় নাই। সেদিন সে গিয়াছিল মাধবদি'র হাটে, সন্ধ্যার কিছু পরে হাট হইতে ফিরিয়া আসিয়াই সে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল বিছানায়, বলিল, বৌ, একটা কাঁথা দে, জর আইল বুঝি।

সুকুমারী ব্যস্ত হইয়া ঘরে ঢুকিয়া বলিল, আবার কী সর্বনাশ অইছে কে জানে! তোলা একখানা কাঁথা বাহির করিয়া সে শঙ্করের উত্তপ্ত শরীরে তাড়াতাড়ি বিছাইয়া দিল। হাত দিয়া কপাল পরীক্ষা করিয়া বলিল, 'ওগো মাগো, গাও যে পুইড়া গেল!'

জ্বরের ঘোরেও শঙ্করের দুষ্টুমি বুদ্ধি যায় না, তাহার হাতখানা সরাইয়া সে বলিল, 'এমনে জর দেহে না।'

'কেমনে?' সুকুমারী তাহার কপালে নিজের গাল রাখিয়া বলিল, 'এমনে?

শঙ্কর তাহার গরম ঠোঁট দুটি সুকুমারীর বরফের মতো ঠাণ্ডা গালে ঘষিয়া জড়িত-স্বরে বলিল, 'হুঁ।'

সুকুমারী হাসিয়া দিল, তাহার গালে মৃদু একটা চড় মারিয়া বলিল, এই বুঝি জ্বরের রুগীর মতন কথা?'

তারপর জর আরও বাড়িয়া চলিল। সেদিনের রাত্রিটা মোটামুটি ভালোই গিয়াছিল। সুকুমারীকে বেশি জাগিতে হয় নাই। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনও ভালোই গেল। চারদিনের দিন বিছানা হইতে উঠিয়া শঙ্কর

বলিল, 'বৌ' তাড়াতাড়ি ভাত বাইড়া দে, আমি আজই ভাত খামু।' শঙ্কর সত্যই স্নান করিতে চলিল। ব্যাপার দেখিয়া সুকুমারীর দুই চক্ষু স্থির। সে তাহার হাত ধরিয়া বলিল, 'এমুন করলে আমি গলায় দড়ি দিয়া মরুম। তড়াতড়ি যাও, শুইয়া থাক গিয়া, জ্বর অহনও ছাড়ে নাই।'

শঙ্করের স্বভাবটা চিরকালই এমনি। কেবল সুকুমারীর আশ্রয়েই সে যেন মানুষের মতো চলিতে-ফিরিতে পারে, নইলে কোথায় ভাসিয়া যাইত কে জানে।

মারা যাওয়ার আগের দিন এক কাণ্ড ঘটিল। রাত্রি তখন অনেক। শঙ্কর হঠাৎ চোখ মেলিয়া ডাকিল, বৌ ?'

সুকুমারী তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া বলিল, 'কও ?'

শঙ্কর আবার ডাকিল, 'বৌ ?'

সুকুমারী বলিল, 'কী ! কও না গো ?'

শঙ্কর তাহার কোলে মুখ গুজিয়া বলিল, 'উঁ।'

সুকুমারী তবু বুঝিতে পারে না, সস্নেহে তাহার মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, 'কী অইছে গো ?'

তবু তাহার কোলের ভিতর মুখ গুজিয়া শঙ্কর গোঙাইতে থাকে, বিড় বিড় করিয়া একমনে কী বলে।

কী একটা কথা মনে হওয়ায় সুকুমারী হঠাৎ ফিক্ করিয়া হাসিয়া দিল, তাহার মুখটি বুকের কাছে টানিয়া আনিয়া বলিল, 'ছিঃ, এমুন পোলাপানের মতন করে না। তোমার যে জ্বর গো !'

শঙ্কর বলিল, 'না, জ্বর না আমার জ্বর না।'

তুমি একটা পাগল। হগল গাও পুইড়া যায় জ্বরে, তব—', সুকুমারী কী করিবে ভাবিয়া পায় না, তাহাকে আরও জড়াইয়া ধরিয়া তাহার মুখের কাছে নিজের মুখটি নিয়া সে বলিল, 'এই লও, খালি চুমা দেও।'

কিন্তু শঙ্কর তাহার মুখ ফিরাইয়া নিয়া, একেবারে পাশ ফিরিয়া শুইল। এবং পরদিনই সে মারা গেল।

সুকুমারী ইহার পর আর কী করিতে পারে? ঘরের এককোণে মুখ গুজিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিতে-কাঁদিতে চোখমুখ তাহার ফুলিয়া গেল, কেবলই মনে হইতে লাগিল, মৃত্যুর আগে শঙ্কর কী একটা জিনিষ তাহার কাছে চাহিয়াছিল, অথচ সে দেয় নাই, হায়, সে কেন রাজী হয় নাই? এমন কঠিন কিছু নয় তো যে কিছুতেই দেওয়া চলে না, হায়, কেন রাজী হয় নাই সে! কাঁদিতে-কাঁদিতে সুকুমারীর দম বন্ধ হইয়া আসে আর ভাবিতে পারে না সে।

ইহার পর হইতেই তাহাকে অনেক নির্জন সন্ধ্যায় অথবা গভীর রাত্রে সেই দেবাংশী বটগাছের নিচে মাথা কুটিয়া কাঁদিতে দেখা যায়। এমন শাদা কাপড় পরা একটা মূর্তিকে হঠাৎ দেখিলে মনে প্রথমে ভয়ই জাগে, কিন্তু কিছু পরেই সেই ভুল ভাঙ্গে। একটা চাপা কান্নার শব্দ কাণে আসিতে থাকে এবং তখন মনে হয়, ওই শাদা কাপড় পরা মেয়েটি শঙ্করের সদ্য বিধবা স্ত্রী সুকুমারী ছাড়া আর কেউ নয়।

তারপরও আরও অনেকগুলি বছর কাটে। অনেক পরিবর্তন এবং তার দ্বিগুণ সম্ভাবনা নিয়া বিংশ শতাব্দী দেখা দিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙলার রাজনৈতিক জীবনে চেতনা আসিল, সুরেন্দ্রনাথ দেবতার আসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, অনেক কলেজ-যুবক তাঁহার গাড়ী টানিয়া কৃতার্থ বোধ করিল। তারপর পৃথিবীতে মহাসমর বাঁধিতেও আর বাকি থাকে না। ভারতবর্ষে সেই যুদ্ধের যাহারা প্রতিবাদ করিল তাহারা জেলে গেল, আর যাহারা করিল না, তাহারা এই বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল যে যুদ্ধের পর কিছু পাওয়া যাইবে।

কিন্তু বাহিরে যাহাই ঘটুক, পীরপুরে তার ছোঁয়াচটুকুও লাগে না, সে তার বটগাছের মতোই নির্বিকার, নির্বিকল্প।

এমন সময় এক সুদর্শন সুবেশ ভদ্রলোককে পীরপুরের নদীর ঘাটে আসিয়া নৌকা হইতে নামিতে দেখা গেল। তিনি এ গাঁয়ের বিশিষ্ট জামাই, বছর-বছর স্ত্রী বাপের বাড়ী আসিলে তিনিও বছর-বছর আসিয়া দেখা দেন। তাঁহার হাতে কী একখানা কাগজ অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে তিনি তাহা পড়িতেছিলেন নৌকা পারে লাগিতেই আবার গুটাইয়া নিলেন এবং লাফ দিয়া পারে নামিয়া পড়িলেন। কিছু দূরেই বটগাছের নিচে পনেরো-ষোলো বছরের এক বালক গভীর মনোযোগে ইহা লক্ষ্য করিতেছিল। সে এ গাঁয়েরই ছেলে। ভদ্রলোক কাছে আসিতে সে তাঁহার দিকে চাহিয়া মুচকিয়া একটু হাসিল ভদ্রলোকও হাসিলেন। তারপর সে তাঁহার পেছু নিল।

ভদ্রলোক ডান হাতে ছড়ি ঘুরাইতে-ঘুরাইতে যে বাড়ীতে গিয়া প্রথম ঢুকিলেন, সে বাড়ীর অবস্থা মোটের উপর ভালোই। তাঁহাকে দেখিয়া কয়েকটি ছেলেমেয়ে 'জামাইবাবু, জামাইবাবু,' বলিয়া কলরব করিয়া উঠিল। কিছুক্ষণ পরে এক প্রৌঢ়া মহিলা ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। এবং আরও লক্ষ্য করিলে দেখা যাইত, বাকারির বেড়ার ফাঁক দিয়া আঠারো-উনিশ বছরের একটি মেয়েও চুপি-চুপি চাহিয়া কী দেখিতেছে।

সেই ছেলেটি হঠাৎ ঘরে ঢুকিয়া বলিল, মৃণালদি; জামাইবাবু এসেছেন। আমি না বলেছিলাম আজ আসবে?

মৃণাল হাসিয়া বলিল, হ্যাঁ, সতু বলেছিলি।

ওদিকে বাইরে জামাই-বেচারীকে নানারকম আদর-যত্নে রীতিমতো ঘায়েল করা হইতেছে।

এক সময় চুপি-চুপি সেখানে গিয়া সতু কাগজখানা খুলিয়া বসিল। কাগজখানা একটি পত্রিকা। সতু প্রথমেই দেখিল, বড়-বড় অক্ষরে কোন্ এক জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক জায়গায় যে এক ভীষণ হত্যাকাণ্ড হইয়াছে, তারই বিশদ বিবরণ দেওয়া; কয়েক হাজার লোকে মিলিয়া একটা মিটিং

হইতেছিল, হঠাৎ দেখা গেল, চারদিক সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্যে ভরিয়া গিয়াছে। তাহারা সেই বিপুল জনমণ্ডলীর চারদিক ঘিরিয়া নির্মমভাবে গুলি চালাইল। চার-শ' লোক সেখানেই মারা গেল, এ-ছাড়া আরও কতো লোক যে শুধু আহত হইয়াছিল, তার ইয়ত্তা নাই। ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত বিরল। পড়িতে-পড়িতে সতুর গা জ্বালা করিল, কখনো মুষ্টি দৃঢ় হইল, এমন কি সে কাঁদিয়া দিল!

এবং ইহার কয়েক বছর পরেই দেখা গেল, এক শুভ অপরাহ্নে গ্রামের একমাত্র এবং শ্রেষ্ঠ পত্রিকা-পাঠক শ্রীযুক্ত মনোহর চক্রবর্ত্তী সমস্ত গ্রাম ভরিয়া শুধু এই কথাটি প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে তাহাদেরই পীরপুর গাঁয়ের রাজেন মিত্তিরের ছেলে সতীন মিত্র—এই তো সেদিনের ছোকড়া—কলিকাতা শহরের কোন্ এক সাহেবকে মারিতে গিয়া নাকি ধরা পড়িয়াছে।

ঘটনা সত্য সন্দেহ নাই।

বটগাছের নিচে আশে-পাশে এমনি আরও অনেক ঘটনা ঘটে। মানুষের মতো দুটি চোখ থাকিলে অনেক কিছু সে দেখিত। সে এখন বৃদ্ধ। এখানে সেখানে কেবল নানা রকমের শিকড়, কোনা-কোনো ডালে হয় তো পোকাও ধরিয়াছে। গায়ের গুড়িটা এত মোটা যে কয়েকটি লোক মিলিয়াও নাগাল পাইবে না। গুড়ির কাছে চারদিকে কে যেন বাঁধাইয়া দিয়াছে। গাছের নিচে প্রকাণ্ড বড় ছায়া এবং সেই ছায়াকে ছাড়াইয়া আরও বড় একটা হাট বসে। ছোটো-ছোটো টিনের ঘরের সারি এত বেশি এবং ঘন যে হাটিবার পথও পাওয়া দুষ্কর।

এখন ১৯৩০ সাল। গান্ধীর আইন-অমান্য আন্দোলন সারা ভারতবর্ষে আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। সেই আগুনের ঢেউ পীরপুর গ্রামেও কিছুটা আসিয়া পোঁছিল। একদিন কোথা হইতে একদল যুবক আসিয়া বাড়ী-বাড়ী ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। তাহাদের সঙ্গে ছোটো একটা হারমনিয়ম। তাহারা স্বদেশী গান গাহিয়া-গাহিয়া বিলাতি বর্জনের কথা বলিয়া কিছু

টাকা-পয়সা সংগ্রহ করিল। লোকগুলি সকলের কাছেই এক অদ্ভুত রহস্যময় জীব, মেয়েরা চুপি-চুপি বিস্ময়ভরা চোখে এই সুদর্শন যুবকদের দেখিল।

বিকালে বটগাছের নিচে বসিল এক সভা। অনেক লোক আসিল। দেখা গেল, কয়েকটি স্ত্রীলোকও সকল সন্তান-সন্ততি সহ বক্তৃতা শুনিতে আসিয়াছেন, তাহারা এক হাত ঘোমটা টানিয়া স্বদেশী বক্তৃতা শুনিলেন। সভায় সভাপতিত্ব করিলেন শ্রেষ্ঠ পত্রিকা-পাঠক মনোহর চক্রবর্তী মহাশয়। তিনি গান্ধীর ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে যে সব অদ্ভুত গল্প শুনিয়াছেন তাহা সমবেত সকল লোকদের শুনাইলেন। একজন শুধু 'বন্দেমাতরম', শব্দেরই ব্যাখ্যা করিলেন। তিনি বলিলেন, 'ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের এই অপূর্ব মন্ত্র আজ প্রত্যেক ভারতবাসীর মুখে-মুখে ফিরিতেছে বটে কিন্তু ইহার অর্থ অনেকেই জানে না। ইহার অর্থ হইল, হে মাতা, তোমাকে বন্দনা করি।' এ ছাড়া সেই যুবকদের মধ্যেও দুই-একজন বক্তৃতা দিলেন।

তারপর একেবারে ১৯৩৯ সাল। বটগাছের মৃত্যু আরম্ভ হইয়াছে, এতদিন চোখে পড়ে নাই, কিন্তু আজ দেখিতে বড় ভয়ানক। কতকগুলি ডাল এখন একেবারে জীর্ণ, পত্রহীন। ছোটো-ছোটো ডাল আর শুকনো পাতা সর্বদা ঝরিয়া পড়ে, এক মুসলমান বুড়ী তা কুড়াইয়া নেয়। গাছের গুড়ির দিকে একটা মস্ত বড় গর্তের মতো, একটা লোক বেশ লুকাইয়া থাকিতে পারে। হাটবারে চারদিকে বাঁধানো জায়গাটিতে অনেকে দোকান সাজাইয়া বসে, অনেকে বেশ আড্ডা মারে, কেউ কাঁঠাল ভাঙিয়াও খায়। মাঝে-মাঝে দুই-একজন সাধুও বসে। যেদিন হাটবার সেদিনের অবস্থা দেখিলে এতকালের ইতিহাসকে ভুলেও মনে করা যায় না, দেখিয়া আশ্চর্য হইতে হয়, একটা ভীষণ কোলাহল চাঁদোয়ার মতো সেই প্রকাণ্ড বটগাছের নিচে গুম্-গুম্ করিতে থাকে।

সেদিনও হাটবার। রাত থাকিতেই নানারকমের নৌকা আসিতেছে। একটার পর একটা করিয়া প্রায় আধ মাইল খানেক নদী সেই নৌকায় ভরিয়া গেল। বেলা বারোটার পর হাট বেশ জমিয়া ওঠে। চারদিক লোকে গিজ্ গিজ্ করে। বাহির হইতে যাহারা আসে তাহাদের চেহারা দেখিলেই বোঝা যায়। তাহাদের গায়ে নানা রকমের জামা থাকে।

ভীড় কোথাও পাতলা বলিয়া মনে হয় না। সব জায়গাতেই সমান। পীরপুর অথবা অন্যান্য গ্রাম হইতে যাহারাই হাট করিতে আসিতেছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই কাঁধে গামছা, আর একটি ঝাঁকা। সকলের মুখেই হাসি, অজস্র কথা। আজ যেন একটা উৎসব। সকলেই আসিয়াই একেবারে হাট করিতে বসিয়া যায় এমন নয়, অনেকক্ষণ এখানে-সেখানে গল্প করিয়া সকলের শেষে তবে হাট করে। এইদিনে কতো পরিচিত লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। ফুলুরি, বেগুনী, জিলিপি—এসব যাহারা ভাজে, তাহাদের কথা বলিবারও অবসর নাই; সকলেই একটি পয়সার অন্তত কিছু কিনিয়া খায়।

হাটের মধ্যে কেমন একটা গন্ধ, যা অন্যদিন পাওয়া যায় না।

ছোটো-ছোটো রাখাল ছেলেরা সস্তা সিগারেট কিনিয়া নির্ভয়ে খাইয়া বেড়াইতেছে। নতুন বিবাহ করিয়াছে যাঁরা, অথবা যাহাদের কাছে তাহাদের স্ত্রীদের গায়ের স্বাদ আজও পুরনো হয় নাই, তাহারা বেশির ভাগই যেখানে গোলাপী রঙের সাবান, চিরুণী ইত্যাদি বিক্রী হয় সেখানে ভীড় করিয়া আছে। গ্রামের একমাত্র খলিফা রহমান তাহার বহু পুরনো সেলাইর কলখানা একেবারে হাটের মাঝখানে নিয়া বসিয়াছে। কতো লোক তাহাদের লুঙ্গি সেলাই করাইয়া নিল, কেউ কেবল জামার ছেঁড়াটুকু তালি দিয়া নিল।

দেখিতে-দেখিতে বেলা একটা বাজিয়া গিয়াছে। এমন সময় এক কাণ্ড ঘটিল। সকলে দেখিল বটগাছের নিচে বাঁধানো জায়গাটিতে দাঁড়াইয়া একটা

লোক বক্তৃতা করিতেছে। লোকটা সেই সতীন মিত্র ছাড়া আর কেউ নয়। আজ নয় বছর পরে কী কারণে হঠাৎ মুক্তি পাইয়া কয়েক মাস হইল সে গ্রামে আসিয়াছে। আসিয়াই সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে দারুণ মিশিতে লাগিল, তাহাদের নিয়া কী জটলা করিতে লাগিল। আর আজ হঠাৎ দেখা গেল, ওই বটগাছের নিচে দাঁড়াইয়া সে বক্তৃতা করিতেছে। তাহার পাশে আর নিচে অনেকগুলি কৃষক। আস্তে-আস্তে অন্যান্য কৃষকরাও একটা কৌতূহলবশে সেখানে গিয়া ভিড়িল। একটা বিপুল জনতার সৃষ্টি হইল।

সতীন বলিতেছিল : আমার চাষী-ভাইরা, চেয়ে দেখুন, সব জিনিষেরই দড় বেড়েছে কিন্তু যা বিক্রী করে আমরা দুটি খেয়ে বাঁচবো, সে সব জিনিষের দড় বাড়েনি ! কেন এমন হলো ?

সকলে তন্ময় হইয়া শুনিতে লাগিল। হায়দরের ছেলে বসির সতীনের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে।

সতীন আবার বলিতেছে : ভাইসব, সমাজের যারা পরগাছা—যারা আমাদের গায়ের রক্ত শুষে শুধু 'বসে' খায়, তাদের উপড়ে ফেলবার দিন এসেছে আজ। ভাইসব, আমাদের জিনিষ দিয়েই ওরা মোটর হাকায়, ব্যাঙ্কে লাখ টাকা জমা রাখে, কিন্তু আমরা না খেয়ে মরি। এ অত্যাচার কেন আমরা সহ্য করবো ? কেন সহ্য করবো ?

এমন সময় আর এক কাণ্ড ঘটিল। হঠাৎ একটা হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল। লাঠি-হাতে মস্ত জোয়ান একদল লোক বাঁধানো জায়গাটীতে উঠিয়া অনবরত লাঠি চালাইতে লাগিল।

দুই-এক ঘা খাইয়াও সতীন চিৎকার করিয়া বলিল, ভাইসব, এদের চিনে রাখুন, এরা সেই জমিদারেরই ভাড়াটে গুণ্ডা, লাঠি চালিয়ে আমাদের মুখ বন্ধ করতে এসেছে !

সতীন আর বলিতে পারিল না, আরও কয়েকটা খাইয়া বসিয়া পড়িল

রক্তে তাহার শরীর ভাসিয়া গেল, যে মাটী এতদিন সিঁদুর আর শত-শত পাঠার রক্তে লাল হইয়াছে, তা আজ মানুষের রক্তে লাল হইয়া গেল।

এক মুহূর্তে যা ঘটিয়া গেল, তা কল্পনাও করা যায় না। ব্যাপার দেখিয়া যে যার মতো পলাইল, আর যাহারা সেই প্রকাণ্ড, বৃদ্ধ এবং জীর্ণ বটগাছের নিচে অত বড় হাটের মাঝখানে মুখ থুবড়িয়া পড়িয়া রহিল, তাহাদের দেখিবার কেউ নাই।

* * * *

ইহার কয়েকদিন পরেই এক ভীষণ ঝড় আসিল, এমন ঝড় এ-অঞ্চলে ইদানীং আর হয় নাই। ঝড়ের ঝাপটা মৃতপ্রায় বটগাছের উপরেই লাগিয়াছিল বেশি। বটগাছ ভাঙ্গিয়া পড়িল, যেন প্রকাণ্ড এক দৈত্য ধরাশায়ী হইল। আর যেটুকু বাকি ছিল, তাহাও কাটিয়া নেওয়া হইল। দেবাংশী গাছের কাঠ ধর্ম্মপ্রাণ হিন্দুরা ব্যবহার করে না বটে কিন্তু স্থানীয় জমিদার উহা বেচিয়া বেশ দু'পয়সা লাভ করিলেন।

দীর্ঘ দুই-শ' বছর পরে, বটগাছ অবশেষে মারা গেল। ইহার নিচে অনেক ইতিহাস রচিত হইয়াছে, কতো দীর্ঘশ্বাস চাপাকান্নার শব্দ ইহার প্রতিটি পাতার নিঃশ্বাসের সঙ্গে জড়িত; ইহার নিচে কতো লোক চাপা পড়িয়াছে, এক রক্তের গঙ্গা বহিয়া গেল, কতো রক্তের বীজ ছড়াইয়া আছে, সেই বীজ হইতে একদিন অঙ্কুর দেখা দিবে, তারপর অনেক নতুন বৃক্ষ জন্ম নিবে, ইহাও আশা করা যায়।